জানুয়ারি ২০২৫

বিজ্ঞান চিন্তা

Daily ePapers
BD
Click here to join the channel

শীতরহস্য

সাক্ষাৎকার

জোসেফ এম আকাবা
প্রধান নভোচারী, নাসা

ডার্ক এনার্জি কি সত্যিই আছে

নিউক্লিয়ার বলের কাহন

নিউক্লিয়ার ঘড়ি

জৈব যৌগের গঠন

বিজ্ঞান রম্য, বিজ্ঞান কল্পগল্প, ছড়া, কমিক, কার্যকারণ

সর্বস্তরে বিজ্ঞান প্রসারে

সিটি ব্যাংক™

citytouch
DIGITAL BANKING

city bank™

making sense of money

ব্যাংকিংয়ের সব এক অ্যাপেই সম্ভব

সকল ব্যাংকিং সেবার ওয়ানস্টপ সল্যুশন সিটিটাচ। ফান্ড ট্রান্সফার থেকে শুরু করে ডিপিএস, ফিক্সড ডিপোজিটসহ প্রয়োজনীয় যেকোনো ব্যাংকিং করতে পারবেন মাত্র কয়েকটা ট্যাপেই। তাই আজই খুলে ফেলুন সিটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আর সিটিটাচ অ্যাপ ডাউনলোড করে উপভোগ করুন ব্যাংকিংয়ের সকল সুবিধা। **সিটিটাচ হাতে, ব্যাংকিং সাথে সাথে।**

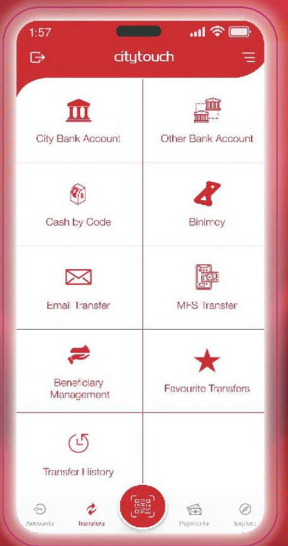

সিটিটাচ
ডাউনলোড করতে
স্ক্যান করুন

ডাউনলোড করুন

citytouch

GET IT ON Google Play

EXPLORE IT ON AppGallery

Available on the App Store

FCB/ITOPI/24

ওয়ান্ডার কেক

ওয়াডারফুল ডে

প্রিয় বন্ধুরা,

শুভেচ্ছা নিও, আশা করি সবাই ভালো আছ। তোমাদের জন্য ওয়াডার কেক আবারও নিয়ে এলো **'ওয়াডারফুল ডে'** ক্যাম্পেইন। এই ক্যাম্পেইনে রয়েছে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, ম্যাজিক শো ও বিভিন্ন ধরনের এক্সাইটিং গেমস। পাশাপাশি থাকবে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট, আকর্ষণীয় পুরস্কার ও ওয়াডার কেক তো থাকছেই।

তাই আর দেরি কেন? পুরোটা দিন স্মরণীয় করে রাখতে তোমরা রেডি তো?

অংশগ্রহণের নিয়মাবলি:

১। অংশগ্রহণের জন্য ওয়াডার ককে ঘিরে তোমার আঁকা যেকোনো ছবি নিচে দেওয়া লিংক অনুযায়ী ফেসবুক পেজ অথবা গুগল ফর্মে তোমার নাম, ফোন নম্বর, ঠিকানা ও স্কুলের নামসহ তোমার অথবা অভিভাবকের আইডি থেকে শেয়ার করো।

২। তোমাদের পাঠানো ছবি থেকে আমরা সেরা ৫০০ জনকে নির্বাচিত করব।

৩। নির্বাচিত ৫০০ জন ওয়াডারফুল ডে ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণের জন্য বিবেচিত হবে। নির্বাচিতদের তথ্য আমাদের ফেসবুক পেজের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

৪। ক্যাম্পেইনের দিনে থাকবে গ্র্যান্ড আর্ট কম্পিটিশন, ম্যাজিক শো ও বিভিন্ন ধরনের এক্সাইটিং গেমস।

৫। গ্র্যান্ড ফিনালে-তে বিজয়ীদের জন্য থাকবে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট, আকর্ষণীয় পুরস্কার ও ওয়াডার গিফট বক্স।

৬। ক্যাম্পেইন বিষয়ক সব তথ্য ওয়াডার কেক-এর ফেসবুক পেজে সরবরাহ করা হবে।

৭। যেকোনো প্রয়োজনে কল করো ০৮০০৭৭৭৭৭৭৭ (টোল ফ্রি) নম্বরে।

তোমার আঁকা ছবি শেয়ার করতে

নিচের QR কোড স্ক্যান করে লগ ইন করো ওয়াডার কেক-এর ফেসবুক পেজে অথবা গুগল ফর্মে

https://www.facebook.com/WonderCake.BD

https://shorturl.at/MwdX0

Facebook

Google

বিশেষ দ্রষ্টব্য: গ্র্যান্ড আর্ট কম্পিটিশনের সব উপকরণ ওয়াডার কেক কর্তৃক সরবরাহ করা হবে।

ENVOY TEXTILES LIMITED

- **WORLD'S FIRST LEED CERTIFIED PLATINUM DENIM MILL**
- **FIRST ROPE-DYEING TECHNOLOGY** IN BANGLADESH
- **FIRST ECO LAB** IN BANGLADESH IN STRATEGIC PARTNERSHIP WITH **JEANOLOGIA**
- **11**-TIME WINNER OF **NATIONAL EXPORT TROPHY**
- WINNER OF **NATIONAL ENVIRONMENTAL AWARD**
- **3**-TIME WINNER OF **PRESIDENT'S INDUSTRIAL DEVELOPMENT AWARD**
- MULTIPLE-TIME WINNER OF **HIGHEST TAXPAYER AWARD**
- **2**-TIME WINNER OF **HSBC EXPORT EXCELLENCE AWARD**
- **LAB ACCREDITATION** BY RENOWNED BRANDS LIKE **LEVI'S, KONTOOR, AMERICAN EAGLE, JCREW, VF, RALPH LAUREN, TARGET,** etc.

EXPORTING WORLDWIDE

www.envoytextiles.com

শীতের বিজ্ঞান

হাড়কাঁপানো শীত পড়ছে বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে। শহরে শীতের তীব্রতা অত বেশি নয়, তবে কমও নয়। এ সময় কম্বল মুড়ি দিয়ে, মোটা কাপড় পরে শুয়ে থাকতেই বেশি ভালো লাগে। তার ওপর হরেক রকমের পিঠাপুলি তো রয়েছেই। এ সময় খানিকটা আরামদায়ক অলসতা স্বাভাবিকভাবেই ঘিরে রাখে আমাদের।

বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঋতু দেখা যায়। বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। ঋতুর পালাবদলের ধারায়ই শীত আসে প্রতিবছর। কিন্তু কী কারণে ঋতুর এমন পালাবদল দেখা যায়? কেন কখনো শীত, কখনো গরম, কখনো বৃষ্টি আবার কখনো নাতিশীতোষ্ণ—না শীত, না গরম?

শীতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নানা রকম রোগবালাই দেখা দেয়। ফেটে যায় হাত-পা-ঠোঁট। এ রকম আরও অনেক প্রশ্ন রয়েছে শীত নিয়ে। কেন শীতকালে বৃষ্টি খুব কম হয়? সবজি বেশি হয় কেন? কুয়াশা কেন পড়ে? আমরা তো মোটা কাপড় পরি, প্রাণীরা কী করে এই তীব্র শীতে? শীত বা ঋতুবৈচিত্র্যের রহস্য, শীতের রোগ ও বাঁচার উপায় এবং এ রকম ডজনখানেক প্রশ্নের উত্তর নিয়ে এবারের সংখ্যা।

মহাবিশ্বে কি ডার্ক এনার্জি সত্যিই আছে, নাকি সেটি শুধুই বিভ্রম? লিখেছেন জ্যোতিঃপদার্থবিদ দীপেন ভট্টাচার্য। পরমাণুর যে মডেল আমরা সচরাচর দেখি, সেটি কি পুরোপুরি ঠিক? তাত্ত্বিক পদার্থবিদ আরশাদ মোমেনের লেখায় রয়েছে এ প্রশ্নের উত্তর। কেমন করে লিখব জৈব অণুর গঠন? হাতে-কলমে শেখাচ্ছেন রসায়নবিদ রউফুল আলম। নিউক্লিয়ার ঘড়ির ভেতরের কথা জানা যাবে গবেষক প্রদীপ দেবের কলমে। জানা যাবে সূর্যের রং-রহস্যের কথা। একগুচ্ছ কমিকস, বিজ্ঞান কল্পগল্প, ছড়া, বিজ্ঞান রম্য, আইনস্টাইনের ধাঁধা, কার্যকারণ, প্রশ্নোত্তরে বিজ্ঞানসহ নিয়মিত সব আয়োজন তো রয়েছেই।

২০২৪ সালটা কেমন ছিল বিজ্ঞানের জগতের জন্য? গত বছরের আলোচিত, গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক কাজগুলো একনজরে দেখে নিতে পারবেন এ সংখ্যায়।

২০২৫ সাল, নতুন বছর, নতুন আয়োজন। বছরের শুরুটাই শুধু নয়, আপনার সারা বছরের পথচলা হোক বিজ্ঞানের সঙ্গে, বিজ্ঞানচিন্তার সঙ্গে।

সবাইকে ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

বিজ্ঞানচিন্তা

জানুয়ারি ২০২৫
পৌষ-মাঘ ১৪৩১
বর্ষ ৯ সংখ্যা ০৪
পঞ্চাশ টাকা

সম্পাদক
আব্দুল কাইয়ুম

উপদেষ্টা পরিষদ
ড. রেজাউর রহমান
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. জেবা ইসলাম সেরাজ
ড. আরশাদ মোমেন
ড. মাহবুব মজুমদার
মুনির হাসান

নির্বাহী সম্পাদক
আবুল বাসার

সহসম্পাদক
উচ্ছ্বাস তৌসিফ
কাজী আকাশ

বিশেষ সহযোগী
রাজীব হাসান

সম্পাদনা দল
ইবরাহিম মুদ্দাসসের

ম্যাগাজিন সমন্বয়ক
শাহাদাত ফয়েজ ওয়াইসি

বিপণন ব্যবস্থাপনা
মো. মহিউদ্দিন রওনক

শিল্প নির্দেশনা
সৈয়দ লতিফ হোসাইন

ডিজাইন
মো. শামীম আলী

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
শামসুল হক

প্রচ্ছদের ছবি : হাসান মাহমুদ

সর্বস্তরে বিজ্ঞান প্রসারে সহযোগিতায়

সিটি ব্যাংক™

প্রকাশক আব্দুল কাইয়ুম কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং ট্রান্সকাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

যোগাযোগ : বিজ্ঞানচিন্তা, প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩। ফ্যাক্স : ৯১২১০৫২।
ওয়েবসাইট : bigganchinta.com
ই-মেইল : editor@bigganchinta.com
ফেসবুক : facebook.com/Bigganchinta

পরিবেশক : প্রথমা
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

সূচিপত্র

মলাট কাহিনি

ঋতুর পালাবদলে প্রতিবছর আসে শীত। বছর ঘুরে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা আসতেই থাকে। কিন্তু কেন এই পালাবদল? শীতকালেই কেন বাড়ে রোগবালাই? বৃষ্টি কেন কম হয়? এমন নানা প্রশ্নোত্তরের সঙ্গে ঋতুবৈচিত্রের রহস্য নিয়ে সাজানো হয়েছে জানুয়ারি সংখ্যা।

শীতরহস্য ও ঋতুবৈচিত্র্য
উচ্ছ্বাস তৌসিফ ১২

শীতের রোগবালাই
তানজিনা হোসেন ১৬

নাক বন্ধ—মুশকিল আসান! ২০

জীবজন্তুদের শীতযাপন
আহমাদ মুদ্দাসসের ২২

কুল কুল প্রশ্ন গরম গরম উত্তর ২৭

কাশির লজেন্সের রসায়ন ৩৩

বিজ্ঞান কল্পগল্প

রক্ষক

লুৎফুল কায়সার **৬৬**

শেষবারের মতো মাথা তোলার চেষ্টা করল প্রাণীটি। কিন্তু তার আগেই পা দিয়ে ওর মাথাটা পুরো পিষে দিলাম। কেমন যেন আঠালো পদার্থ বেরিয়ে এল, থক করে ছিটকে এসে পড়ল আমার মুখের ওপর। আশপাশে তাকালাম, ওরই মতো আরও চারজন পড়ে আছে। সব মরেছে আমার হাতে।

বিজ্ঞান রম্য

সায়েন্স মিউজিয়াম

আহসান হাবীব **৯**

পৃথিবীখ্যাত পদার্থবিদ নীলস বোরের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী বিজ্ঞানীর ব্যবহৃত জামাকাপড় ও জিনিসপত্র নিয়ে তাঁর ঘরেই একটা পারিবারিক জাদুঘর তৈরি করেছিলেন...

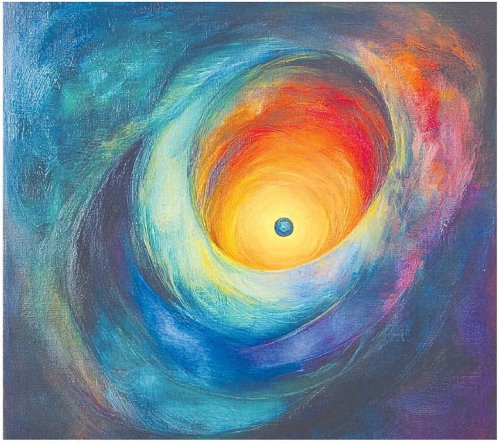

ফিচার

ডার্ক এনার্জি কি সত্যিই আছে
দীপেন ভট্টাচার্য ৪৪

নিউক্লিয়ার বলের কাহন
আরশাদ মোমেন ৪৮

নিউক্লিয়ার ঘড়ি
প্রদীপ দেব ৫০

সূর্যের রংঢং
আবুল বাসার ৫৩

জৈব যৌগের গঠন
রউফুল আলম ৫৬

প্লাস্টিকের রকমফের
আব্দুল্লাহ আল মাকসুদ ৬২

খামার রহস্য
কাজী আকাশ ৬৫

সালতামামি ২০২৪ ৬৯

চোখ যে ডিপফেকের কথা বলে! ৭৩

সাক্ষাৎকার

মহাকাশে ভেসে বেড়ানো দুর্দান্ত ব্যাপার
—জোসেফ এম আকাবা, প্রধান নভোচারী, নাসা ৪০

বিজ্ঞান কমিক
৩৪, ৩৬

রকমারি বিজ্ঞান

পুঞ্জাক্ষি ৬০
ব্যায়াম বা ছোটাছুটি করলে গা থেকে গন্ধ আসে কেন ৬৪
নাসির আল-দিন আল-তুসি ৭৪

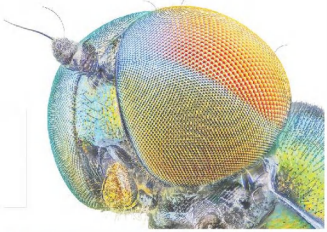

বিজ্ঞান ছড়া

নাক বন্ধ
রোমেন রায়হান ১০

নিয়মিত বিভাগ

ডাকবাক্স ৭
গণিতের সমস্যা ১৯
দুই চালে মাত ৩৯
বইপত্র ৫৯
বিজ্ঞানায়োজন ৭২
কার্যকারণ ৭৬
প্রশ্নোত্তরে বিজ্ঞান ৭৭
সুডোকু ৭৭
গণিতের কুইজ ৭৮
কুইজ ৭৯

শত তরুণের জীবন জয়ের গল্প

বাংলাদেশের Gen Z বিশ্বাস করে সব সম্ভব

মূল্য
~~৫০০ টাকা~~
২৫০ টাকা
(সীমিত সময়ের জন্যে)

ফ্রি ডাউনলোড | অনলাইনে ফ্রি পড়ুন

পরিচিতদের সাথে শেয়ার করুন

The SCIENCE of LIVING QUANTUM METHOD

quantummethod.org.bd

পোকামাকড়ের ঘরবসতি!

শিরোনাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বিজ্ঞানচিন্তার প্রতি সংখ্যায় দেওয়া সাম্প্রতিক ধারাবাহিক একটি কমিকসের কথা বলছি। গত সংখ্যাটা আমার জন্য ছিল অভূতপূর্ব! আর কমিকসটা তো ছিল একদম সুপার। বিজ্ঞানচিন্তা, তোমার বিজ্ঞানীদের নিয়ে করা সংখ্যাটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমাদের সাদা-কালো বইয়ে বিজ্ঞানীদের কথা পড়তে পড়তে যখন বারবার ভুলে যাচ্ছি, কোন বিজ্ঞানী কী আবিষ্কার করেছিলেন, তখন তুমি এ রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা উপহার দিলে। তা ছাড়া হাসান খুরশিদ রুমি স্যারের সাক্ষাৎকারটাও কিন্তু খুব শিক্ষণীয়। তোমার দেওয়া পরমাণু খুঁড়তে গিয়ে, পেট্রোলিয়াম জেলি কীভাবে আর্দ্রতা রক্ষা করে, এগুলো আমার জন্য জানা খুব জরুরি ছিল। সব মিলিয়ে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে। আমি চাই, ভবিষ্যতেও তুমি এভাবে বিজ্ঞানের শিক্ষণীয় ও মজার মজার কমিকস এবং গুরুত্বপূর্ণ ফিচার ছাপবে। ভালো থেকো।

মো. নানজিব ফাহিম, সপ্তম শ্রেণি, এ বি এম গ্র্যাজুয়েট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

ভাই-বোন রহস্য

প্রথমেই একটা কেস রিপোর্ট। বলে রাখা ভালো ধাঁধা, গোয়েন্দাগিরি কিংবা রহস্য উন্মোচন—এসব ব্যাপারে আমার আগ্রহ সাংঘাতিক। তারই সুবাদে গত সংখ্যায় চিঠিগুলো পড়ার সময় পরপর দুটি নাম দেখে বেশ খটকা লাগল। আমার অনুসন্ধানী চোখজোড়া যেন কোনো একটা প্যাটার্ন খুঁজে পেল ওই দুটি নামের মধ্যে। সে দুটি নাম হলো 'আফরা আরিবা আরিশা' ও 'আহনাফ আবরার আনান'। যখনই দেখলাম তারা দুজনে কুষ্টিয়া জেলায় থাকে, তখনই আমার ধারণা সঠিক হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা জাগল। কিন্তু আর কোনো প্রমাণ ছাড়া কি কাউকে ভাই-বোন বলে চালিয়ে দেওয়া যায়? কাকতালীয়ও তো হতে পারে। তার ওপর তাদের আর কোনো ভাই-বোন চিঠি লিখেছে কি না, তার কোনো ইঙ্গিত নেই। তখন শুরু করলাম গভীর বিচার-বিশ্লেষণ। পেলামও বটে মিল। দুজনেই তাদের চিঠিতে বলেছে, 'কিডন্যাপ' গল্পটা তাদের পছন্দ হয়েছে। কিন্তু এটাকে কোনো শক্ত প্রমাণ হিসেবে নিতে পারছিলাম না এই কারণে যে 'কিডন্যাপ' গল্পটা বিজ্ঞানচিন্তার আরও হাজারো পাঠকের ভালো লাগতে পারে। ঠিক যে মুহূর্তে আমার গোয়েন্দা মস্তিষ্ক নিরেট প্রমাণের খোঁজে আঁতিপাঁতি করছে, ঠিক তখনই পেয়ে গেলাম সেই কাঙ্ক্ষিত লাইনজোড়া। যেখানে আরিশা লিখেছে, তার কাছে এ পর্যন্ত ২৩টি সংখ্যা আছে এ বছরের অক্টোবরের সংখ্যা ছাড়া। অপর দিকে আনান লিখেছে, মাঝে অক্টোবরের সংখ্যাটা তার নাকি পড়া হয়নি। যাকে বলে একেবারে খাপে খাপ মিলে যাওয়া। দুজনেই পরবর্তী সময়ে চিঠিতে লিখেছে, ওই সংখ্যাটা কিনে পড়ার চেষ্টা করবে তারা। এটাই ছিল রহস্যের মোড়ক উন্মোচনকারী লাইনজোড়া। কারণ, বাসায় অক্টোবর সংখ্যা থাকলে দুজনেই তা পড়তে পারত। যেহেতু নেই, তাই তারা কেউই পড়তে পারেনি। আশা করি, তারা দুজন কিংবা একজন প্রত্যুত্তরে জানাবে আমার এই ডিডাকশন ঠিক আছে কি না।

আর হ্যাঁ, ক্রিমিনোলজির সঙ্গে বিজ্ঞানের যুগলবন্দীতে একটা জমজমাট সংখ্যা চাই। ফরেনসিক সায়েন্সের আদ্যোপান্ত, অপরাধী শনাক্তকরণ থেকে কেস ইনভেস্টিগেশন—এসব কাজে কীভাবে বিজ্ঞান জড়িত, সেসবের সাতসতেরো যেন ওই সংখ্যায় থাকে, তা নিশ্চিত কোরো। এ বছর আরও চমক দেখতে চাই। নতুন বছরের শুভকামনা রইল।

লিসান আহমেদ, এসএসসি পরীক্ষার্থী, রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

চমৎকার চমক

ডিসেম্বর মাস হলো আমাদের বিজয়ের মাস। আর এই বিজয়ের মাসে লাল-সবুজে লেখা বিজ্ঞানচিন্তা। নিচে এক এক করে বাংলার সেরা বিজ্ঞানীদের ছবি, আসলেই চোখ আটকে যাওয়ার মতো। কেননা এত বড় বড় বিজ্ঞানীকে একসঙ্গে এক মলাটে দেখা আসলেই রোমাঞ্চকর। বিজ্ঞানচিন্তার এই সংখ্যায় প্রতিটি পাতা উল্টো যেন মনে হয়, সেরা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আমারাও পাঠক হিসেবে সেরা। জীবনকে বিজ্ঞানময় করার জন্য নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

আল মামুন, একাদশ শ্রেণি, কালীপুর হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, চাঁদপুর

পঞ্চম শ্রেণি থেকে শেষ চিঠি

ডিসেম্বর সংখ্যাটা দারুণ ছিল। দারুণ নয়, বরং অসাধারণ ছিল। তোমার তো প্রত্যেক সংখ্যাই হয় অসাধারণ! অভূতপূর্ব! আকর্ষণীয়! নিখুঁত! অপূর্ব! সেরা জ্ঞানের বাহক তুমি! বিজ্ঞানবিষয়ক ম্যাগাজিনের মধ্যে তুমি অসাধারণ। যেখানে অন্য ম্যাগাজিনগুলো শুধু সাদা-কালো পৃষ্ঠায় থাকে, সেখানে তোমার ত্রিমাত্রিক ছবি দেখে মন ভরে যায়। এই নভেম্বর মাসে তোমার সঙ্গে আমার এক বছর পূর্ণ হলো। তোমার পৃষ্ঠার মান অনেক ভালো, আবার দামটাও খুব বেশি নয়, কিন্তু তুমি অনেক পাতলা। তবু সমস্যা নেই। তোমার প্রতিটি সংখ্যার জন্য আমি অধীর অপেক্ষায় থাকি। তেমনি তোমার আরও সুন্দর, অসাধারণ, আশ্চর্য, আকর্ষণীয়, জানুয়ারির মাসের সংখ্যার জন্য আমি অধীর অপেক্ষায় থাকব। 'একজন কৃষকের বিজ্ঞানী হয়ে ওঠার কাহিনি'টা খুব মজার ছিল। বিজ্ঞানচিন্তা বলেই এত মজার কাহিনি এখানে ছাপা হয়। কার্যকরণের সিস্টেমটা খুবই দারুণ। এবার আমি তোমাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করেছি। জানি, আমার উত্তরগুলো পেয়েই যাব। কারণ, বিজ্ঞানচিন্তা কখনো দেরি করে না।

পঞ্চম শ্রেণির পরিচয়ে এটা আমার তোমার কাছে পাঠানো শেষ চিঠি। হয়তো পরে তুমি আমার আরও চিঠি পাবে।

তোমার অতি মূল্যবান পৃষ্ঠায় আমার এই ছোট্ট চিঠিকে একটু জায়গা দিয়ো। একটু ছেপে দিয়ো।

তোমার জ্ঞান সময়মতো আরও আরও আরও বাড়তে থাকুক। আর সেই জ্ঞান যেন আমরাও একটু একটু করে পাই। একটা আবদার রেখে যাই; সেটা হলো, ইলেকট্রনিকস সম্পর্কে একটি সংখ্যা ছাপিয়ো, যাতে গাড়ি সম্পর্কে তথ্যবহুল ফিচার থাকে; যদিও তোমার সব ফিচারই অনেক তথ্যবহুল। তোমার জন্য আমার শুভকামনা সব সময়ই থাকে, প্রিয় বিজ্ঞানচিন্তা।

আরাফাত ওয়াহিদ, পঞ্চম শ্রেণি, ভদ্রা, রাজশাহী

আমাদের লিখুন

বিজ্ঞানচিন্তা

১৯, প্রথম আলো ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫
ওয়েবসাইট : www.bigganchinta.com
ই-মেইল : editor@bigganchinta.com
ফেসবুক : fb/Bigganchinta

গণিত অলিম্পিয়াড সিরিজ ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের বই

জনপ্রিয় বিজ্ঞান ও গণিত লেখক

সৌমেন সাহা • সৌমিত্র চক্রবর্তী

সংকলন ও সম্পাদনা

ব্লুমস ট্যাক্সোনমি : বিজ্ঞানসম্মত কাঠামোবদ্ধ শিখন পদ্ধতি

এছাড়াও রয়েছে গণিত ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক শতাধিক বইয়ের প্রকাশনা। আজই সংগ্রহ করুন।

Anupam Prakashani ৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০ ফোন : ৪৭১১৪২৪৩

anupamprokashani@gmail.com anupam prokashani- অনুপম প্রকাশনী

অনলাইনে বই পেতে ফোন করুন অথবা ভিজিট করুন: http://rokomari.com/anupam 16297/47114243

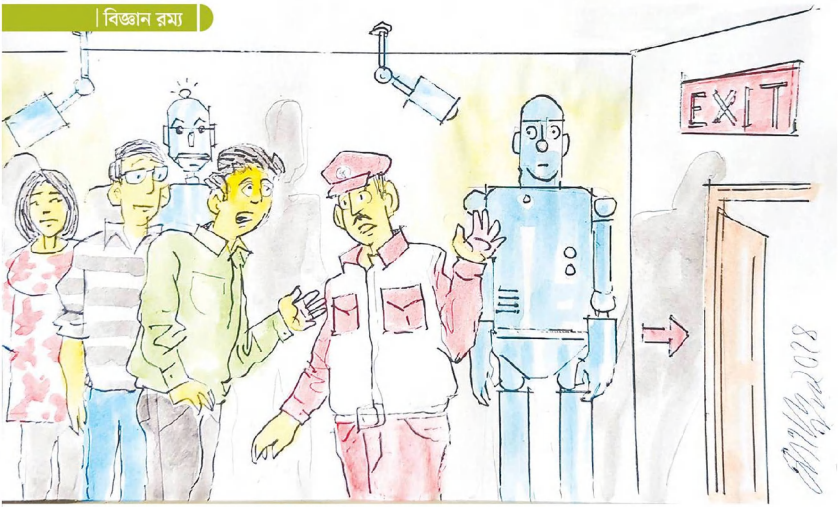

সায়েন্স মিউজিয়াম

আহসান হাবীব

> অবশ্যই এ আসলে 'এআই রোবট'। কথা বলা, চিন্তা করা, তর্ক করা, সব পারে—একদম মানুষের মতো

পৃথিবীখ্যাত পদার্থবিদ নীলস বোরের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী বিজ্ঞানীর ব্যবহৃত জামাকাপড় ও জিনিসপত্র নিয়ে তাঁর ঘরেই একটা পারিবারিক জাদুঘর তৈরি করেছিলেন। তবে সেটা জনগণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। বিজ্ঞানীর ঘনিষ্ঠজনেরা ঢুকতে পারতেন, বিজ্ঞানীর স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে।

—আমি ওই জাদুঘরে, আই মিন নীলস বোরের ফ্যামিলি মিউজিয়ামে ঢুকতে পেরেছিলাম, দাবি করে বসে দেশ-বিদেশ ঘোরা এক বঙ্গদেশীয় পুঙ্গব, এক চায়ের আড্ডায়।

—বলেন কী! সত্যিই আপনি ওখানে, মানে ওই মিউজিয়ামে ঢুকতে পেরেছিলেন?

—অবশ্যই।

—কিন্তু ওটা তো নীলস বোরের শুধু পারিবারিক বন্ধুবান্ধবের জন্য উন্মুক্ত ছিল। আপনি তা নন।

—কিন্তু আমার সেই সৌভাগ্য হয়েছিল এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথাও হয়েছে!

—বলেন কী! উনি কী বলেছেন আপনাকে?

—উনি আমার সঙ্গে একটা বাক্যই বলেছেন; বঙ্গদেশীয় যেন এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

—সেটা কী?

—গেট আউট!

দ্বিতীয় একটি মিউজিয়ামে ঢুকি এবার। এটাও একটা সায়েন্স মিউজিয়াম। তবে বিজ্ঞানী নীলস বোরের মতো ফ্যামিলি মিউজিয়াম নয়। এটা জনগণের জন্য উন্মুক্ত, রোবটদের একটা স্পেশালাইজড মিউজিয়াম। নানা রকম রোবট এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে। সেই আঠারো শতকের রোবট, সেই উনিশ শতকের রোবট...এ রকম। একজন গাইড সুন্দর করে দর্শকদের ব্যাখ্যা করতে করতে চলেছেন।

—এই রোবটটা দেখুন, আঠারো শতকের একটি রোবট। এটা কথা বলতে পারত না। তবে হাঁটতে পারত, হ্যান্ডশেক করতে পারত, হাগ করতে পারত...আর এই রোবটটা দেখুন, এ কথা বলা রোবট...আর এই রোবটটা মানুষের মতো চিন্তা করতে পারত। বলতে বলতে গাইড দর্শকদের মিউজিয়ামের এক্সিট ডোরের কাছে দাঁড়ানো শেষ রোবটটার কাছে চলে এল।

—এই রোবট তো মনে হচ্ছে অনেক আধুনিক। এক দর্শক মন্তব্য করে।

—অবশ্যই এ আসলে 'এআই রোবট'। কথা বলা, চিন্তা করা, তর্ক করা, সব পারে—একদম মানুষের মতো। এর মুখভঙ্গি দেখে আমি পর্যন্ত বুঝতে পারছি সে কী বলতে চাচ্ছে।

—বলেন কী! এখন তার মুখভঙ্গি ঠিক কী বলতে চাচ্ছে?

—ইয়ে...'এই গাইডকে সবাই উপযুক্ত বকশিশ দিয়ে জাদুঘর ত্যাগ করুন!'

লেখক : রম্য লেখক ও কার্টুনিস্ট; সম্পাদক, উদ্ভাস

নাক বন্ধ

রোমেন রায়হান

তিনটি জেনারেশন নিয়ে যৌথ পরিবারে
বসবাসের অসুবিধা বুঝছি হাড়ে হাড়ে!
সকাল থেকে নাক বন্ধ (কমন যেটা শীতে)
শুনেই বাসার সবাই হাজির চিকিৎসাটা দিতে!

ডিগ্রিবিহীন চিকিৎসকে কোত্থেকে যে শেখে!
মা এনেছেন আদার কুচি অল্প লবণ মেখে!
ধমকে বলেন, চিবিয়ে খা, দেখবি আদার রসে
নাক খুলেছে, সর্দি ঝরা আসছে দ্রুত বশে!

শিকড় খেয়ে দাদা থাকেন সুস্থভাবে বেঁচে
খবর পেয়ে হাজির হলেন রসুনকোয়া ছেঁচে!
বলেন, মুরব্বিদের কথা ভাল্লাগে না জানি!
নাক বন্ধের চিকিৎসা এই রসুনছেঁচা পানি!

পানির ভেতর লেবুর রস ও অল্প মধু ঢেলে
টোটকা নিয়ে হাজির হলো বড় চাচার ছেলে!
হাত বাড়িয়ে বলল, নে খা, এই যে দিলাম ঘুলে
দিনে দুবার খেলেই যাবে দুই নাসিকা খুলে!

ছোট চাচাও বাদ গেল না, হনহনিয়ে হেঁটে
কিচেন থেকে টুকরো করে আনল পেঁয়াজ কেটে!
নাকের কাছে পাঁচটি মিনিট ধরতে হবে বলে
যেই দ্রুততায় এসেছিল সেটায় গেল চলে!

বাসায় যেটা সবার ছোট সেটাও বসে ভাবে
চিকিৎসকের লিস্টি থেকে সে কেন বাদ যাবে!
গলার আওয়াজ ভরাট করে তাই তো দেখি বলে
নাক বন্ধের সমস্যা দূর মেনথলে মেনথলে!

নাক বন্ধের চিকিৎসাতে আছি বিশাল চাপে!
আদা, রসুন, লেবু, পেঁয়াজ, আর মেনথলভাপে
নাক না খোলায় স্বাচ্ছন্দ্যে পারছি না শ্বাস নিতে
মুখ হাঁ করেই রাখতে হবে আমায় পুরো শীতে?

অলংকরণ : **রাকিব**

ই চালান এর মাধ্যমে

এক্সিম ব্যাংকের সকল শাখা ও উপশাখায়

আমাদের আন্তরিক সেবা নিন

আমাদের সেবাসমূহ

- পাসপোর্ট ফি ও জাতীয় পরিচয়পত্র ফি
- পুলিশ ক্লিয়ারেন্স ফি
- নির্বাচনী জমা
- কোম্পানিসমূহ কর্তৃক দেয় আয়কর
- ব্যক্তিকর্তৃক দেয় আয়কর
- দেশজ পণ্য ও সেবার ওপর মূসক
- আবগারী শুল্ক, কাস্টমস শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক
- দেশজ উৎপাদিত পণ্যের উপর সম্পূরক শুল্ক
- কাজের জন্য জমা
- আমদানি পণ্যের উপর মূসক
- নামজারি ও জমাখারিজ ফি
- আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স ফি
- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি
- ভ্রমণ কর ও ভ্রমণ ব্যয়
- বিজ্ঞাপন কর ও ভূমি উন্নয়ন কর
- দরপত্র দলিল ফি
- অন্যান্য লাইসেন্স ফি
- পরিক্ষা ফি, জরিপ ফি ও কোর্ট ফি
- পেনশন জমা
- বিবাহ নিবন্ধন ফি
- স্ট্যাম্প ডিউটি ও নবায়ন ফি

EXIM BANK
শরী'আহ্ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ পিএলসি.

সবধরনের ব্যাংকিং তথ্যের জন্য 16246

www.eximbankbd.com

শীতরহস্য ও ঋতুবৈচিত্র্য

উচ্ছ্বাস তৌসিফ

যত দিন যাচ্ছে, শীতের দৈর্ঘ্য যেন কমে আসছে, বাড়ছে তীব্রতা। শীত বা গ্রীষ্ম কেন হয়, এর পেছনের বিজ্ঞান ও শীতের আবহাওয়ার আদ্যোপান্ত...

Daily ePapers
BD
Click here to join the channel

'বন বন পৃথিবীটা ঘুরছে ঘুরছে শুধু, চলছে নানা রঙের খেলা।' নচিকেতার 'ইটস আ গেম' গানের লাইন, শুনেছেন হয়তো। কথাগুলো ঋতুবৈচিত্র্যের জন্য খেটে যায় সুন্দরভাবে।

বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। অন্তত ছোটবেলা থেকে আমরা তা-ই শুনে এসেছি। শহরে অবশ্য গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত ও বসন্ত—এই চারটিই মোটাদাগে বোঝা যায়। তবে গ্রামে শরৎ ও হেমন্ত স্পষ্ট। বিশেষ করে হেমন্ত। হেমন্তের শেষে, অগ্রহায়ণে ধান কাটা হয়। নবান্ন উৎসবে আজও আনন্দের ঢল নামে।

এখন চলছে শীতকাল। ক্রমেই শীত পড়ছে। শহরের চেয়ে গ্রামে এই শীতের মাত্রা অনেক বেশি। হরেক রকম পিঠাপুলি বানানো হচ্ছে ঘরে-বাইরে। এই লেখা পড়তে পড়তে আপনিও হয়তো পিঠা নিয়ে বসেছেন। আরাম করে পিঠায় কামড় দিতে দিতে একটু ভাবুন, শীতকাল কেন হয়? কেন এত ঋতুবৈচিত্র্য? সূত্র দেওয়া আছে নচিকেতার গানে।

দুই

অনেকে ভাবেন, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের কারণে ঋতুবৈচিত্র্য ঘটে। পৃথিবীর কক্ষপথ উপবৃত্তাকার। সহজ করে বললে, ডিম্বাকার। তাই সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব পরিবর্তনশীল। পৃথিবী যখন নিজ কক্ষপথে সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে, তখন এ দূরত্বের মান দাঁড়ায় ১৪৭ মিলিয়ন কিলোমিটারের মতো। সবচেয়ে দূরে থাকলে এ মান দাঁড়ায় প্রায় ১৫৩ মিলিয়ন কিলোমিটার। গড়পড়তা হিসাবে এ দূরত্ব ১৪৯ মিলিয়ন কিলোমিটার ধরা হয়। দূরত্বের পরিবর্তন এ ক্ষেত্রে মাত্র ৪ শতাংশের মতো। এটুকু পার্থক্য সৌরজগতের বিপুল পরিসরের হিসাবে নিতান্ত সামান্য। ঋতুর মতো বড় পরিবর্তন এ কারণে হয় না। ঘুরেফিরে আবার সেই প্রশ্ন, তাহলে কেন হয় ঋতুবৈচিত্র্য?

বুঝতে হলে খানিকটা ভূগোল জানতে হবে। কেউ যেন রাগ করে বলবেন না, 'তুমি এসেছ আমাকে ভূগোল বোঝাতে?' আপাতত ছোট্ট করে ভূগোল—মানে, পৃথিবীর গোল গোল

করে চক্কর খাওয়ার বিষয়টা বুঝে নেওয়া যাক।

পৃথিবীটাকে একটা গোলক ধরে নিন। যদিও ঠিক গোলক নয়; পাঠ্যবইয়ে এককালে লেখা হতো—কমলালেবুর মতো, দুই পাশে একটু চাপা। এই চাপা দুটো অংশই পৃথিবীর দুটি মেরু। উত্তর ও দক্ষিণ মেরু। এই মেরু বরাবর একটা কাঠি—কাল্পনিক কাঠি, তবে মনে মনে ভেবে নিন, একটা টেনিস বলের ভেতর একটা কাঠি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে; এই কাঠির দুই মাথা দুই মেরুতে। তাহলে পৃথিবীটা ঘুরবে কোন বরাবর? পশ্চিম থেকে পূর্বে। বিজ্ঞানীরা এই কাল্পনিক কাঠিকে বলেন অক্ষ। এই অক্ষের ওপর, অক্ষকে কেন্দ্র করে পৃথিবীটা পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘোরে বলেই আমরা সূর্যকে সাতসকালে পুবে উঠতে দেখি। পৃথিবী কিন্তু বন বন করে ঘুরেই চলে—ফলে ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে সূর্য অস্ত যায়। অর্থাৎ এই অক্ষীয় ঘূর্ণনের ফলে পৃথিবীতে দিন-রাত হয়।

পূর্ব থেকে পশ্চিম বরাবর বিজ্ঞানীরা একটা কাল্পনিক রেখা ভেবে নিয়েছেন। এই রেখার নাম বিষুবরেখা। এই রেখার উত্তর পাশটা উত্তর গোলার্ধ, তার একদম মাথায়, সেই কাল্পনিক কাঠির একদিকে উত্তর মেরু। আর অন্য পাশটা দক্ষিণ গোলার্ধ। এর একদম মাথায়, কাঠির অন্য প্রান্তে দক্ষিণ মেরু।

আরেক ধরনের ঘূর্ণন আছে পৃথিবীর। সূর্যকে ঘিরে ডিম্বাকার একধরনের কক্ষপথে পৃথিবী ঘুরছে। একে বলা হয় বার্ষিক গতি। কক্ষপথের ওপর এভাবে একপাক ঘুরতে পৃথিবীর প্রায় ৩৬৫ দিন লাগে। এটাকে আমরা বলি এক বছর। এই কক্ষীয় গতি বা কক্ষপথের ওপর ঘূর্ণনের বিষয়টা আমাদের কাজে লাগে ঋতুবৈচিত্র্য বুঝতে। সঙ্গে মাথায় রাখতে হবে আরেকটা জিনিস।

পৃথিবী নামের বলটা নিজ অক্ষের (মানে, সেই কাল্পনিক কাঠিটা) ওপর সাড়ে ২৩ ডিগ্রি হেলে আছে। ফলে বছরের (অর্থাৎ কক্ষপথ ধরে ঘোরার) কিছু সময় উত্তর মেরু সূর্যের দিকে থাকে, দক্ষিণ মেরু থাকে উল্টো দিকে (নিচের ছবির মতো)। কিছু সময় আবার এর উল্টোটা হয়। অর্থাৎ দক্ষিণ মেরুটা থাকে সূর্যের দিকে, আর উত্তর মেরু থাকে উল্টো দিকে। যে মেরু সূর্যের দিকে থাকে, সে মেরুতে সূর্যের আলো বেশি ও সরাসরি পড়ে এবং দিনের দৈর্ঘ্য বড় হয়। দিনের দৈর্ঘ্য বড় হওয়া মানে দীর্ঘ সময় সূর্যের আলো পাওয়া। তার ওপর এ আলো পড়ছে সরাসরি। দীর্ঘ সময় ধরে এভাবে সরাসরি সূর্যের আলো পাওয়ার ফলে পৃথিবীর এদিকের গড় তাপমাত্রা বেড়ে যায়। সে কারণে এদিকে গ্রীষ্মকাল হয়। মানুষের দেহের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ৯৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট। সরল করে বললে, পরিবেশের তাপমাত্রা এর চেয়ে বেশি হলে আমাদের গরম লাগে। অবশ্য এর সঙ্গে বাতাসের আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহের বেগসহ বেশ কিছু বিষয় রয়েছে। যাহোক, আপাতত সেটি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। এ থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন গ্রীষ্মকালে গরম লাগার রহস্য।

এপ্রিল থেকে জুন-জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশ (এবং পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ) সূর্যের দিকে থাকে। ফলে এ সময় উত্তর গোলার্ধের অঞ্চলগুলোতে গ্রীষ্মকাল থাকে।

> একটু ভাবলেই বোঝা যাবে, বাংলাদেশ বিষুবরেখার কাছাকাছিই রয়েছে। ফলে এখানে শীত কিছুটা কম, মোটামুটি আরামদায়ক অবস্থা

উল্টো দিকে, অর্থাৎ দক্ষিণ গোলার্ধে এ সময় দিনের দৈর্ঘ্য হয় কম, ফলে সূর্যের আলো ও তাপ পাওয়ার পরিমাণও কম হয়। এ কারণেই সে সময় এখানটায় শীতকাল বিরাজ করে।

উল্টো দিকে ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির সময়টায় উত্তর গোলার্ধের অঞ্চলগুলো—এর মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে—সূর্য থেকে দূরে থাকে (অক্ষের ওপরে সাড়ে ২৩ ডিগ্রি বেঁকে থাকার কারণেই)। এর ফলে এ অঞ্চলে এই তিন মাস সূর্যের আলো সরাসরি পড়ে না। একটু বাঁকাভাবে পড়ে। বিষুবরেখার একদম কাছের অঞ্চলগুলো তা-ও কিছুটা কম বাঁকাভাবে আলো পায়। কিন্তু উত্তর মেরুর দিকে যত এগোব, দেখব, আলো তত বাঁকা হয়ে পড়ছে। ফলে সেদিকে শীত আরও বেশি; তবে বিষুবরেখার ওপরের অঞ্চলগুলোতেও দিনের দৈর্ঘ্য কম হওয়ায় এবং আলো কিছুটা বাঁকা হয়ে পড়ায় মোটাদাগে শীতই থাকে।

একটু ভাবলেই বোঝা যাবে, বাংলাদেশ বিষুবরেখার কাছাকাছিই রয়েছে। ফলে এখানে শীত কিছুটা কম, মোটামুটি আরামদায়ক অবস্থা। উত্তর মেরুর কাছাকাছি কী অবস্থা, সেটা বোধ হয় আর আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই। শুরুতেই যে বলেছিলাম, বন বন পৃথিবীটা ঘুরছে—সেই কক্ষীয় ঘূর্ণন ও অক্ষের ওপর সাড়ে ২৩ ডিগ্রি বেঁকে থাকা, এই দুটোই যে শীতের মূল কারণ, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

তিন

এটুকু বুঝে ফেললে এবার আনুষঙ্গিক কিছু বিষয় নিয়ে আলাপ করা যাক। যেমন ঋতু বা মৌসুমের পরিবর্তন কীভাবে হয়? সে জন্য প্রথমে বলি, মোটাদাগে পৃথিবীতে চারটা ঋতু ভালোভাবে বোঝা যায়। গ্রীষ্ম, শীত, বসন্ত ও শরৎ। এই বিষয়টা আমরা উত্তর গোলার্ধ বা বাংলাদেশের সাপেক্ষে বোঝার চেষ্টা করি।

ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি আমাদের এখানে শীতকাল চলে, এটুকু আগেই বলেছি। এ সময় দিনের দৈর্ঘ্য ছোট হয়ে যায়, রাত বড় হয়; কারণ সূর্যের আলো একটু বাঁকাভাবে পড়ে। একই সময় দক্ষিণ গোলার্ধে চলে গ্রীষ্মকাল।

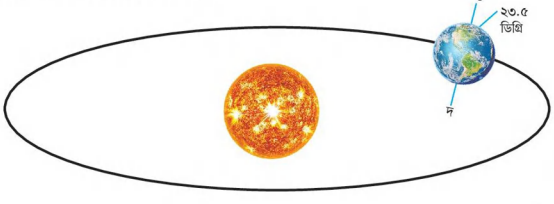

পৃথিবী এভাবেই নিজ অক্ষের ওপরে সাড়ে ২৩ ডিগ্রি হেলে থাকে।

শীতের পরেই আসে বসন্ত। বলা যায়, ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ—এ সময়টুকু বসন্তকাল। এই সময়টাকে বলা হয় নাতিশীতোষ্ণ। অর্থাৎ না গরম, না শীত। কারণটা তো বুঝতেই পারছেন—পৃথিবীটা অক্ষের ওপর হেলে থেকে নিজ কক্ষপথের ওপর এমনভাবে থাকে যে দুই গোলার্ধেই সূর্যের আলো মোটামুটি সমানভাবে পড়ে। ফলে দিন-রাতের দৈর্ঘ্য এ সময় সমান হয়। তাপমাত্রা গড়পড়তা হিসাবে অনেক বেশি বা কম হয় না। তাই আরামদায়ক বসন্ত আসে।

এপ্রিল থেকে জুনের সময়টা উত্তর গোলার্ধের জন্য গ্রীষ্মকাল। এ সময় উত্তর গোলার্ধে সূর্যের আলো একদম সরাসরি পড়ে। জুন মাসে গোটা উত্তর গোলার্ধ সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে। এ সময় দিন সবচেয়ে বড় হয়, রাত ছোট হয়ে যায়। একই সময় দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল চলে।

বসন্তের উল্টো বলা যায় শরৎকে। আগস্ট-সেপ্টেম্বরে এই শরৎকাল দেখা যায়। শীতের পরে যেমন বসন্ত পেরিয়ে গেলেই আসে গ্রীষ্ম, তেমনি গ্রীষ্মের পর শরৎ পেরোতেই আসে শীত। অর্থাৎ এ সময় আবারও সূর্যের আলো দুই গোলার্ধে সমানভাবে পড়ে, দিন ও রাতের দৈর্ঘ্যও মোটামুটি সমান হয়।

বাংলাদেশের একটা মজার ব্যাপার আছে। এখানে ঋতু শুধু চারটি নয়, ছয়টি। বাকি দুটো ঋতুর আলাদা অস্তিত্ব স্পষ্ট বোঝা যায়। বিশেষ করে বর্ষা।

গ্রীষ্মের পর, মোটামুটি জুন থেকে আগস্টে প্রচুর বৃষ্টি হয়। এ সময়টা আমাদের জন্য বর্ষাকাল। গ্রীষ্মেরই একটা অংশ বলা যায় একে এই অর্থে যে এ সময় উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকেই থাকে; সাধারণত এ সময় আমাদের এমনিতে গরম লাগে। তবে কি, বাংলাদেশের পাশেই সমুদ্র। আবার হিমালয়ও কাছেই। এই দুইয়ে মিলে—জল ও স্থলে বাতাসের আচরণের ওপর ভিত্তি করেই মূলত বর্ষা আসে। ভাসিয়ে নিয়ে যায় সব।

অন্যদিকে শরতের পরে শীতের আগে আসে হেমন্ত। এ সময়টা মোটাদাগে শরতের মতোই, তবে শীতের আঁচও খানিকটা পাওয়া যায়। বাতাসের আর্দ্রতা কমতে থাকে, বৃষ্টিপাত হয় না সাধারণত। ধান পাকে, কৃষকের ঘরে আসে

ঋতুবৈচিত্র্যের পেছনের বিজ্ঞান

অক্ষের ওপর বেঁকে থাকার কারণেই পৃথিবীতে এত ঋতুবৈচিত্র্য। পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে কক্ষপথের ওপরে ঘোরে বটে, সে কারণেই বছর হয়, তবে অক্ষরেখার ওপর এটি কিন্তু একই দিকে বেঁকে থাকে।

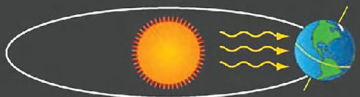

ডিসেম্বর
বিষুবরেখার দক্ষিণে গ্রীষ্মকাল। আর এ রেখার উত্তরে শীতকাল। এ ক্ষেত্রে দক্ষিণ গোলার্ধের ওপর সরাসরি সূর্যের তাপ পড়ছে আর পরোক্ষভাবে পড়ছে উত্তর গোলার্ধে।

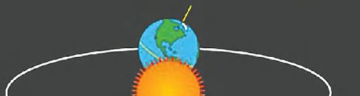

মার্চ
বিষুবরেখার দক্ষিণে শরৎ আর উত্তরে বসন্ত। দুই গোলার্ধে সূর্যের আলো সমানভাবে পড়ছে।

জুন
বিষুবরেখার দক্ষিণে শীতকাল, উত্তরে গ্রীষ্ম। এ ক্ষেত্রে উত্তর গোলার্ধের ওপর সরাসরি সূর্যের তাপ পড়ছে আর পরোক্ষভাবে পড়ছে দক্ষিণ গোলার্ধে।

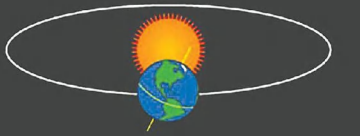

সেপ্টেম্বর
বিষুবরেখার দক্ষিণে বসন্ত আর উত্তরে শরৎ। দুই গোলার্ধে সূর্যের আলো সমানভাবে পড়ছে।

নতুন অন্ন, মানে নবান্ন।

মোটাদাগে ঋতুবৈচিত্র্যের বিষয়টা এ থেকে বোঝা গেল। শেষ করার আগে টুকিটাকি কিছু বিষয় হালকাভাবে বুঝে নেওয়া যাক।

চার

আমরা প্রায়ই শুনি, শৈত্যপ্রবাহ চলছে। এই শৈত্যপ্রবাহ কী? আবহাওয়াবিজ্ঞানে শৈত্যপ্রবাহ মানে একটা বিশেষ অবস্থা। ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে পরিবেশের তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে গিয়ে ওই অঞ্চলের গড় সর্বনিম্ন অবস্থায় পৌঁছালে তাকেই বলে শৈত্যপ্রবাহ। অঞ্চলভেদে এই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমবেশি হতে পারে। বাংলাদেশের জন্য বিষয়টা কেমন? ডিসেম্বর, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে গেলে এবং অন্তত তিন দিন এই তাপমাত্রা স্থায়ী হলে তাকে বলা হয় শৈত্যপ্রবাহ।

আমরা জানি, শীতে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে যায়। এর ফলে বৃষ্টিও হয় কম। এ রকম আরও বেশ কিছু খুঁটিনাটি বিষয় রয়েছে। এই বিষয়গুলো নিয়ে অবশ্য আলাদা করে 'মাথায় কত প্রশ্ন আসে' অংশে আলোচনা করা হয়েছে। তাই এখানে আর এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত বলছি না।

পাঁচ

আরেকটি কৌতূহলী বিষয় হলো, অনেকে হয়তো খেয়াল করেছেন, ক্রমে শীতকালের দৈর্ঘ্য যেন ছোট হয়ে আসছে। অল্প কিছুদিন শুধু শীতের দেখা পাওয়া যাচ্ছে। এদিকে যে কদিন শীত থাকে, তীব্র শীত পড়ে। কেন এমন হচ্ছে?

এর কারণ, এককথায় বললে, জলবায়ু পরিবর্তন। দিন দিন পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। কোপার্নিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিস, বার্কলি আর্থ ও ইউকে মেট অফিস হিসাব করে দেখিয়েছে, শিল্পবিপ্লবের পর এই প্রথম কোনো বছরের গড় তাপমাত্রা দেড় ডিগ্রি বেড়েছে। গত বছরের তাপমাত্রাও অনেক বেশি ছিল। ফলে গ্রীষ্মকাল আরও দীর্ঘ ও উষ্ণ হয়ে উঠছে। শীতকাল ছোট হয়ে যাচ্ছে এর ফলেই। গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে বায়ুমণ্ডলে, এর প্রভাবেই এমনটা হচ্ছে।

বাংলাদেশে এর প্রভাবটা ভয়ংকর। আগেই বলেছি, আমাদের একদিকে সমুদ্র। তা ছাড়া আমাদের দেশটি হিমালয়ের কাছাকাছি। হিমালয়ের তীব্র বায়ুপ্রবাহ বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে গেলে তাপমাত্রা অনেক কমে যায়। শৈত্যপ্রবাহের পেছনে এর ভূমিকা রয়েছে। সমস্যা হলো, ধীরে ধীরে হিমালয়ের বরফ গলছে। ফলে ওদিক থেকে আসা শীতল বায়ু এখন অতটা শক্তিশালী বা দীর্ঘস্থায়ী নয়। ওদিকে উষ্ণ আবহাওয়া, নগরায়ণ, গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রভাব এবং জলবায়ুর মোট পরিবর্তনে শীতের দৈর্ঘ্য কমে যাচ্ছে। কিন্তু বরফ গলে যাওয়ার পর হিমালয় থেকে যে শীতল বাতাস আসে, তা খুব তীব্র হয়। উত্তর থেকে আসা এই শীতল বায়ু হালকা হয়ে নিচে নেমে আসে, ছুঁয়ে যায় বাংলাদেশকে। এটি শীতের তীব্রতা বাড়ার একটি বড় কারণ। আরও কিছু কারণ রয়েছে, যেমন দূষণের প্রভাব। ফলে কুয়াশা স্থায়ী হয় বেশিক্ষণ, শীত বেশি অনুভূত হয় ইত্যাদি। এই সব মিলে আমাদের শীতকাল ক্রমে ছোট হয়ে আসছে, তীব্র হচ্ছে শীত।

এটি মোটেও ভালো কথা নয়। উষ্ণতার এই বৃদ্ধি যদি না কমানো যায়, আমরা যদি সচেতন না হই শিগগিরই, ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে ঋতুবৈচিত্র্য। আমাদের প্রজন্ম বা পরের প্রজন্মের জন্য বাংলাদেশের ভয়ংকর গরম হয়ে উঠবে নরকসম। আমরা নিশ্চয়ই আমাদের পরের প্রজন্মের জন্য এমন একটি দেশ বা পৃথিবী রেখে যেতে চাই না।

লেখক : সহসম্পাদক, বিজ্ঞানচিন্তা

শীতের রোগবালাই

তানজিনা হোসেন

শীতের সঙ্গে সর্দি-কাশির সম্পর্ক কী, কেন ব্যথা বেড়ে যায়, একজন চিকিৎসকের কলমে জেনে নিন শীতের রোগবালাই ও প্রয়োজনীয় সতর্কতা...

শীত এলে আবহাওয়া শীতল তো হয়ই, সেই সঙ্গে কমে যায় বাতাসের আর্দ্রতা। ধুলাবালুর পরিমাণ বাড়ে, বাড়ে বায়ুদূষণ। কুয়াশা ও শিশির পড়ে সকাল-সন্ধ্যা। কিছু ভাইরাস ও জীবাণুর জন্য তাপমাত্রার তারতম্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। ফলে শীত এলে কিছু রোগবালাইয়ের প্রকোপ বেড়ে যায়। এ ক্ষেত্রে শ্বাসতন্ত্র, ত্বকের রোগ, ব্যথা-বেদনা, বাতরোগ ও হাইপোথার্মিয়া উল্লেখযোগ্য।

শ্বাসতন্ত্রের রোগ

যাঁদের শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা আছে, যেমন হাঁপানি বা অ্যাজমা, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের রোগী বা যাঁদের কোল্ড অ্যালার্জি আছে, তাঁদের জন্য শীতকাল বেশ কষ্টের। এ সময় বাতাসের শীতলতা ও শুষ্কতা এবং বায়ুদূষণের কারণে তাঁদের সমস্যা বেড়ে যায়। এ মৌসুমে হাঁপানি রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রবণতা বাড়ে। আবার এ সময় ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে বলে শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণও বেড়ে যায়। শ্বাসতন্ত্রের যে রোগগুলো এ সময় বেশি হয়, সেগুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

প্রথমেই ফ্লুর কথা বলি। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের আক্রমণে ফ্লু হয়। এটি বাতাসে ড্রপলেট (তরলের ফোঁটা বা কণা) আকারে ছড়ায় বলে দ্রুতই একজন থেকে অন্যজনের দেহে সংক্রমিত হয়। ফলে বাড়িতে, স্কুলে বা ভিড়ভাট্টায় একজন থেকে বহুজন আক্রান্ত হতে পারেন। এতে নাক, গলনালি আর শ্বাসতন্ত্রের উপরিভাগ আক্রান্ত হয় এ সময়। জ্বর, সর্দি, হাঁচি, কাশি, গলা খুসখুস, গলাব্যথা, মাথাব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। ভাইরাসের সংক্রমণ বলে এর তেমন কোনো চিকিৎসা নেই, তবে টিকা রয়েছে। শীতের শুরুতে বয়স্ক ব্যক্তি ও দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা এই টিকা নিয়ে নিলে ভালো। ফ্লু হলে বিশ্রাম, যথেষ্ট তরল, পুষ্টিকর খাবার ও প্যারাসিটামলই চিকিৎসা। ভাইরাস জ্বর সাত দিনের মধ্যে এমনিতেই সেরে যাবে।

রেসপিরেটরি সিনসাইটিয়াল ভাইরাস (আরএসভি) নামের একধরনের ভাইরাসের সংক্রমণ বেড়ে যায় শীতকালে। এই ভাইরাস শিশুদের আক্রমণ করে। শীত মৌসুমেই এ আক্রমণ সবচেয়ে বেশি হয়। উপসর্গ অনেকটা ফ্লুর মতোই—জ্বর, সর্দি, কাশি, অরুচি, বুকে ঘড়ঘড় শব্দ। নবজাতক ও প্রিম্যাচিউর শিশুদের জন্য জটিল হতে পারে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ৭-১৪ দিনের মধ্যে সেরে যায়।

নিউমোনিয়ার কথা আমরা সবাই জানি। শীতকালে এই নিউমোনিয়া বা ফুসফুসের সংক্রমণ বেড়ে যায়। ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনি, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, লিজিওনেলা ইত্যাদি জীবাণু গুরুতর নিউমোনিয়া সৃষ্টি করতে পারে। উচ্চমাত্রার জ্বর, তীব্র কাশি, কফ, মাথাব্যথা ও শ্বাসকষ্টের মতো উপসর্গ দেখা যেতে পারে এ সময়। রোগের তীব্রতা বেড়ে গেলে রেসপিরেটরি ফেইলিউর হয়ে মারাও যেতে পারেন রোগী। নিউমোনিয়া হলে তাই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে দ্রুত অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসা শুরু করা উচিত। প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া লাগতে পারে।

আরেকটি বড় সমস্যা হাঁপানি। শীতকালে হাঁপানি রোগীর শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায় শীতল আবহাওয়া ও ধুলাবালুর জন্য। শ্বাসের সঙ্গে বাঁশির মতো আওয়াজ বা ঘড়ঘড় শব্দ, শ্বাসকষ্টের জন্য কথা শেষ করতে না পারা এবং পাঁজরের খাঁচা দেবে যাওয়ার মতো লক্ষণ দেখা দিলে বুঝতে হবে হাঁপানির মাত্রা তীব্র হয়েছে। অনেক সময় সমস্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে অক্সিজেন, নেবুলাইজার, স্টেরয়েড ইনজেকশন দরকার হতে পারে। তাই যাঁদের হাঁপানি আছে, শীতের শুরুতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ইনহেলারের মাত্রা ঠিক করে নিলে ভালো।

ব্রঙ্কাইটিস নামের আরেকটি সমস্যা আছে। ধূমপায়ীরা সাধারণত ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের রোগী হয়ে থাকেন। শীতে তাঁদের কাশি, কফ, শ্বাসকষ্ট বাড়ে। বায়ুদূষণে তাঁদের সমস্যা হয় সবচেয়ে বেশি। হাঁপানি রোগীর মতোই অক্সিজেন, নেবুলাইজার, অ্যান্টিবায়োটিক দরকার হতে পারে তাঁদের এ সময়।

ত্বকের রোগ

শীতকালে পরিবেশের মতো ত্বকও শুষ্ক হয়ে পড়ে। বাড়ে ত্বকের নানা সমস্যা। ঠোঁট ফাটা, পা ফাটার মতো সমস্যা তো আছেই। এর সঙ্গে শীতে বাড়ে মাথার খুশকি বা সেবোরিক ডার্মাটাইটিস, ত্বকের একজিমা বা অ্যাটপিক ডার্মাটাইটিস, সোরিয়াসিস, স্ক্যাবিস বা খোসপাঁচড়ার মতো সমস্যা। এসব সমস্যায় ত্বক শুষ্ক হয়ে ফেটে যায়, কখনো লাল হয়ে যায়, চুলকায়। শীতে ত্বক সুস্থ রাখতে যথেষ্ট পানি পান করতে হবে, যাতে ত্বক পানিশূন্য না হয়ে যায়। ত্বক আর্দ্র রাখতে বারবার ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে। খুব গরম পানি ব্যবহার করলে শুষ্কতা বাড়ে, তাই হালকা গরম পানি দিয়ে গোসল ও অন্য কাজ করতে হবে।

ফ্লু হলে বিশ্রাম, যথেষ্ট তরল, পুষ্টিকর খাবার ও প্যারাসিটামলই চিকিৎসা। ভাইরাস জ্বর সাত দিনের মধ্যে এমনিতেই সেরে যাবে

প্রতিবার হাত-মুখ ধোয়া বা গোসলের পর আর্দ্র অবস্থাতেই ময়েশ্চারাইজার লাগানো ভালো। ঠোঁটে ভালো মানের পেট্রোলিয়াম জেলি বা গ্লিসারিন লাগানো ও ঠোঁট চাটা বা চামড়া ওঠানোর অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। পায়ে সব সময় সুতি মোজা পরা ভালো। পা রাতে ভালো করে পরিষ্কার করে পুরু করে ময়েশ্চারাইজার লাগাতে হবে। খুশকি রোধে অ্যান্টি-ড্যানড্রাফ শ্যাম্পু ব্যবহার, মাথার ত্বক পরিষ্কার রাখা জরুরি। একে অন্যের তোয়ালে, বালিশ, চিরুনি, পোশাক ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না। স্ক্যাবিস বা খোসপাঁচড়া সংক্রামক। তাই হোস্টেলে, মেসে, স্কুলে ছড়ায়। শীতে এই রোগের প্রকোপ বাড়ে। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে পরিবারের সবাই বা এক ঘরের সবাই একসঙ্গে চিকিৎসা নিতে হবে।

ব্যথা-বেদনা ও বাতরোগ

শীতে বাতরোগী ও বয়স্কদের ব্যথা-বেদনা বেড়ে যায়। এর কারণ, ক্ষুদ্র রক্তনালির ঠান্ডাজনিত সংকোচন ও জয়েন্টে রক্তপ্রবাহ কমে যাওয়া। এ ছাড়া বায়ুচাপের তারতম্য জয়েন্টের ব্যথা বাড়িয়ে দিতে পারে। শীতে বয়স্কদের সচলতা কমে, এটিও ব্যথা বাড়ার একটি বড় কারণ। ব্যথা কমাতে হলে একটু সচল হতে হবে, ব্যায়াম ও শরীরচর্চা করলে রক্তসঞ্চালন বাড়বে। শীতে বাইরে হাঁটতে যাওয়া সম্ভব না হলে ঘরেই ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করা ভালো। গরম সেঁক দিলে রক্তপ্রবাহ বাড়ে এবং শীতে বেশ আরাম পাওয়া যায়। অনেকে রাতে হট ওয়াটার ব্যাগ সঙ্গে নিয়ে শুতে যান। তাঁরা সাবধান থাকবেন

শীতে ব্যথা-বেদনা বেড়ে যায় কারণ, ক্ষুদ্র রক্তনালির ঠান্ডাজনিত সংকোচন ও জয়েন্টে রক্তপ্রবাহ কমে যায়

ঠান্ডা ও সর্দির জন্য দায়ী ভাইরাস

সাধারণ সর্দি

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা বছরে দুই থেকে পাঁচবার সর্দিতে আক্রান্ত হন।

শিশুরা আক্রান্ত হয় ৭ থেকে ১০ বার।

২০০-এর বেশি ভাইরাস ঠান্ডা ও কাশির সঙ্গে সম্পর্কিত

সর্দিতে আক্রান্ত হওয়ার দুই থেকে চার দিন পর এর সর্বোচ্চ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

সর্দি থাকে ৭ থেকে ১০ দিন।

ভাইরাসের সংখ্যা ও তাদের দ্রুত মিউটেশনের কারণে সর্দি ও কাশির বিরুদ্ধে টিকা তৈরি করা খুব কঠিন। সর্দি যেহেতু ব্যাকটেরিয়া নয়; বরং ভাইরাসের কারণে হয়, তাই এর চিকিৎসার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যায় না। সর্দির শুরু থেকে জিংক অ্যাসিটেট-সমৃদ্ধ লজেন্স খেলে দ্রুত সর্দি ভালো হতে পারে।

রাইনোভাইরাস

৩০ থেকে ৫০ শতাংশ সর্দির জন্য দায়ী রাইনোভাইরাস

তিনটি প্রজাতি মানুষকে রোগাক্রান্ত করে

এদের ব্যাস ৩০ ন্যানোমিটার

রাইনোভাইরাসের তিনটি প্রজাতি মানুষকে আক্রমণ করে। এদের দেহে প্রায় ১৫০ ধরনের সেরোটাইপ থাকে। নাকের ভেতর ৩৩ থেকে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রাইনোভাইরাস সবচেয়ে দ্রুত বাড়ে। গ্রিক শব্দ 'রাইনো' (বাঁ নাক) থেকে এমন নামকরণ করা হয়েছে। সবচেয়ে ছোট ভাইরাসগুলোর মধ্যে এরা অন্যতম।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস

সর্দির জন্য ৫ থেকে ১৫ শতাংশ ক্ষেত্রে এ ভাইরাস দায়ী

এ ভাইরাসের তিনটি প্রজাতি মানুষকে আক্রান্ত করে

এদের ব্যাস ১২০ ন্যানোমিটার

ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের সংক্রমণ সাধারণত ফ্লু বা সর্দি হিসেবে পরিচিত। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস A—এর মধ্যে খুব সাধারণ। মানুষের দেহে এর ১২টি সেরোটাইপ আছে। প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে প্রচুর মানুষ এই ভাইরাসের কারণে সর্দিতে আক্রান্ত হন। ফ্লু থেকে রক্ষা পেতে প্রতিবছর এ ভাইরাসের সক্রিয় ধরনগুলো কী হতে পারে, তা অনুমান করে টিকা তৈরি করা হয়। তবে ভাইরাসের ধরন অনুমানের সঙ্গে না মিললে বা ভাইরাস মিউটেশন করলে এই টিকা কাজে লাগে না।

করোনাভাইরাস

সর্দির জন্য ১০ থেকে ১৫ শতাংশ করোনাভাইরাস দায়ী

সাতটি প্রজাতির ভাইরাস মানুষকে আক্রান্ত করে

এদের ব্যাস ১২০ ন্যানোমিটার

জ্বরসহ মারাত্মক কিছু লক্ষণ দেখা যায় করোনাভাইরাসের সংক্রমণে। অনেক সময় নিউমোনিয়াও বাঁধে। ল্যাটিন শব্দ 'করোনা' মানে মুকুট। করোনাভাইরাসের বাইরের দিকটা দেখে এমন নামকরণ করা হয়েছে।

অন্যান্য ভাইরাস

রেসপিরেটরি সিনসিটিয়াল ভাইরাস :	৫%
প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস :	৫%
অ্যাডেনোভাইরাস :	<৫%
এন্টারোভাইরাস :	<৫%
মেটাপনিউমোভাইরাস :	?%
অজানা ভাইরাস :	২০-৩০%

যেসব ভাইরাসের কারণে সর্দি-কাশি হয়, সেগুলো নানারকম জটিল পদ্ধতিতে শনাক্ত করা যায়। অন্তত ৫ শতাংশ মানুষ দুই বা আরও বেশি ভাইরাসের আক্রমণের কারণে সর্দিতে আক্রান্ত হন। তা ছাড়া ভবিষ্যতে হয়তো সর্দি-কাশির জন্য দায়ী আরও ভাইরাস শনাক্ত হতে পারে।

কম্পাউন্ড কেমিস্ট্রি অবলম্বনে **আব্দুল্লাহ আল মাকসুদ**

শীতকালে বয়স্কদের সাবধানে থাকা প্রয়োজন

যেন অতিরিক্ত গরম ক্রমাগত ত্বকে লেগে পুড়ে না যায়। গরম পানির সেঁক নেওয়ার সময়ও সাবধান; অতিরিক্ত গরম পানিতে পা ডুবিয়ে অনেকে পা পুড়িয়ে ফেলেন। এ সমস্যা বেশি হয় ডায়াবেটিক রোগীদের। কারণ, তাঁদের স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য অনুভূতি কম থাকে। অনেকে রুম হিটার ব্যবহার করেন। তাঁদের ঘরের বাতাস বেশি শুষ্ক হয়ে পড়তে পারে। তাই ঘরের কোণে এক গামলা পানি রেখে দিলে ভালো।

হাইপোথার্মিয়া

পরিবেশের তাপমাত্রা যখন অনেক নিচে নেমে যায়, তখন যাঁরা বাইরে তীব্র ঠান্ডায় অনেকক্ষণ কাজ করেন, তাঁদের ফ্রস্টবাইট, হাইপোথার্মিয়ার মতো সমস্যা হতে পারে। বয়স্ক ব্যক্তি, ছোট শিশু, ভবঘুরে, গৃহহীন মানুষ, কৃষক ও অন্য যাঁরা বাইরে এবং ভেজা জায়গায় কাজ করেন, তাঁরা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। হাইপোথার্মিয়া হলে দেহের তাপমাত্রা ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের নিচে নেমে যেতে পারে। কাঁপুনি, শীতল ত্বক, তারপর ধীরে ধীরে অসংলগ্ন কথাবার্তা, চেতনা কমে যাওয়া থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। হাত-পা ও উন্মুক্ত স্থানে ফ্রস্টবাইট হতে পারে। তীব্র ঠান্ডায় রক্তনালির তীব্র সংকোচন থেকে নীলচে ও ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া, অনুভূতিহীন হয়ে পড়া থেকে শুরু করে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে গ্যাংগ্রিন হতে পারে ফ্রস্টবাইট হলে।

তীব্র শীতে তাই অবশ্যই স্তরে স্তরে পোশাক পরতে হবে, মাথায় গরম টুপি, হাতে দস্তানা ও পায়ে মোজা পরতে হবে। শীতে কাউকে হাইপোথার্মিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে থাকতে দেখলে দ্রুত বাইরের ঠান্ডা আবহাওয়া থেকে ঘরে বা অপেক্ষাকৃত উষ্ণ স্থানে নিতে হবে। ভেজা কাপড় থাকলে তা খুলে গরম শুকনা কাপড় পরাতে হবে বা কম্বল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গরম পানির বোতল দিয়ে রাখা যেতে পারে। তবে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়াই উত্তম।

রোগবালাই ছাড়াও শীতে দুর্ঘটনার প্রবণতাও বাড়ে। আমাদের দেশে শীতকালে গরম পানি গায়ে পড়ে পুড়ে যাওয়া এবং আগুন পোহাতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার সংখ্যা অনেক। বাড়িতে পানি গরম করার সময় শিশুদের দূরে রাখতে হবে, সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কুয়াশার মধ্যে যানবাহন দুর্ঘটনাও ঘটে। সে ক্ষেত্রেও সাবধানতা দরকার। শীত এলে বেড়ানো ও উৎসব-অনুষ্ঠান বেড়ে যায়। সতর্ক থাকলে নানা রকম অসুস্থতা ও দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব।

লেখক : অধ্যাপক, এন্ডোক্রাইনোলজি ও মেটাবলিজম বিভাগ, গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ

গণিতের সমস্যা ৯৭

শ্রেণি অনুসারে নিচের গণিতের সমস্যার সমাধান করে আমাদের কাছে পাঠান। সঠিক সমাধানদাতা তিনজন পাবেন রকমারি ডটকমের সৌজন্যে ৫০০ টাকার বই। উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ জানুয়ারি। খামের ওপর **গণিতের সমস্যা ৯৭** লিখুন। নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর স্পষ্ট করে লিখুন।

প্রাইমারি

একটি সুষম বহুভুজের অভ্যন্তরীণ কোণ এবং বহিঃস্থ কোণের ব্যবধান 100 ডিগ্রি হলে সুষম বহুভুজের বাহুর সংখ্যা কত?

জুনিয়র

একটি বাক্সে 7টি নীল বল, 9টি লাল বল ও 10টি সাদা বল রয়েছে। দৈবচয়নে বাক্স থেকে একটি একটি করে বল উত্তোলন করা হলো, যতক্ষণ না একই রঙের চারটি বল অথবা ন্যূনতম প্রতিটি রঙের দুটি বল উত্তোলন করা হয়। এভাবে সর্বোচ্চ কতটি বল উত্তোলন করা যাবে?

সাধারণ

n একটি পাঁচ অঙ্কবিশিষ্ট প্যালিনড্রমিক সংখ্যা এবং 7n একটি ছয় অঙ্কবিশিষ্ট প্যালিনড্রমিক সংখ্যা হলে n এর সর্বোচ্চ মান কত?

গণিতের সমস্যা ৯৬-এর বিজয়ী

নওশীন আক্তার, সালথা, ফরিদপুর
অনিন্দ্য পোদ্দার, বকশীগঞ্জ, জামালপুর
লাবণি রহমান, পাংশা, রাজবাড়ী

গ্রন্থনা : **নাফিস তিহাম**, একাডেমিক সমন্বয়ক
বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি

সুডোকু ০১ উত্তর

৭	৮	৩	৫	২	৪	১	৬	৯
৫	১	৬	৯	৩	৭	২	৪	৮
৯	২	৪	১	৬	৮	৭	৫	৩
৬	৯	৮	৭	৫	৩	৪	১	২
৪	৩	৭	৬	১	২	৯	৮	৫
১	৫	২	৮	৪	৯	৬	৩	৭
৮	৬	৫	২	৭	১	৩	৯	৪
২	৪	১	৩	৯	৫	৮	৭	৬
৩	৭	৯	৪	৮	৬	৫	২	১

সুডোকু ০২ উত্তর

৫	৭	১	২	৩	৪	৯	৮	৬
৯	৩	৬	১	৫	৮	৭	৪	২
৮	২	৪	৯	৭	৬	৫	১	৩
৪	১	৭	৩	৮	৯	২	৬	৫
৩	৬	৫	৪	২	৭	৮	৯	১
২	৮	৯	৬	১	৫	৪	৩	৭
১	৯	৮	৭	৬	২	৩	৫	৪
৭	৫	৩	৮	৪	১	৬	২	৯
৬	৪	২	৫	৯	৩	১	৭	৮

নাক বন্ধ—মুশকিল আসান!

শীতকাল মানেই নাক বন্ধ। হাঁ করে নিশ্বাস নিতে হয়। এই সমস্যায় চিকিৎসকেরা একধরনের ওষুধ দেন। এই ওষুধের নামই ডিকনজেস্ট্যান্ট। মানে নাকের জট খোলার ওষুধ।

ডিকনজেস্ট্যান্ট নাকের রক্তনালিগুলোর ফোলা কমিয়ে দেয়। রিসেপ্টর বা স্নায়ুগ্রাহকের ওপর কাজ করে এই ওষুধ, ফলে অনুনাসিক গহ্বরের টিস্যুর ভেতরের নালিগুলো সংকুচিত হয়।

বেশ কিছু রাসায়নিক এই কাজ করতে পারে। এর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকরটি হলো সুডোএফেড্রিন। প্রকৃতিতে এফেড্রা প্রজাতির উদ্ভিদে পাওয়া যায়। তবে নানা ধরনের ইস্ট বা ছত্রাক, ডেক্সট্রোজ ও বেনজালডিহাইড নামের বেশ কিছু রাসায়নিক মিলিয়ে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা হয়। প্রেসক্রিপশন ছাড়াও পাওয়া যায়, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার করা উচিত নয়। এর বিকল্প হতে পারে অক্সিমেটাজোলিন, ফেনাইলেফ্রিন, জাইলোমেটাজোলিনসহ বেশ কিছু রাসায়নিক।

এই ওষুধ স্প্রে ও ট্যাবলেট—দুই রকমভাবেই পাওয়া যায়। নাকের স্প্রেগুলো তুলনামূলক দ্রুত কাজ করে। কিন্তু এগুলো দীর্ঘ সময় ব্যবহার করলে পুনরায় নাক বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বেশ কদিন ব্যবহার করলে ব্যবহার বন্ধের পর পরিস্থিতি খারাপও হতে পারে। সে জন্য এ ধরনের ওষুধ অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।

ডিকনজেস্ট্যান্টের রসায়ন

কীভাবে কাজ করে এই ডিকনজেস্ট্যান্ট? চলুন দেখে নিই একনজরে।

সুডোএফেড্রিন

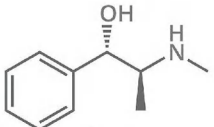

সক্রিয় থাকে : প্রায় ৮ ঘণ্টা।
কিছু কিছু দেশে এর ব্যবহার সীমিত। কারণ, কিছু ক্ষতিকর রাসায়নিক তৈরিতে এটি কাজে লাগে।

অক্সিমেটাজোলিন

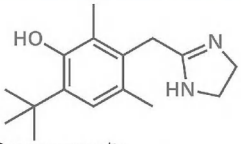

সক্রিয় থাকে : প্রায় ৭ ঘণ্টা।
চোখের লালচে ভাব ও নাকের রক্তপাতের প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ফেনাইলেফ্রিন

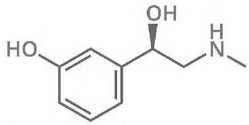

সক্রিয় থাকে : প্রায় ৪ ঘণ্টা।
সুডোএফেড্রিনের বিকল্প। তবে এর কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

জাইলোমেটাজোলিন

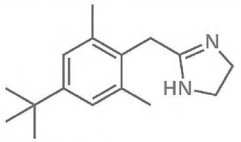

সক্রিয় থাকে : ৫-৬ ঘণ্টা।
এটি উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য ব্যবহার না করার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

গ্রন্থনা : বিজ্ঞানচিন্তা ডেস্ক, সূত্র : কম্প্যাক্ট কেমিস্ট্রি

সহজ ও নিরাপদ রেমিট্যান্স সেবায় রূপালী ব্যাংক

প্রবাসীদের আস্থা রূপালী ব্যাংকের রেমিট্যান্স সেবা

WESTERN UNION WU moving money for better

ria Money Transfer

MoneyGram money transfer

Network powered by TRANSFAST

small world

NATIONAL EXCHANGE

NEC MONEY

AL ANSARI EXCHANGE

MERCHANTRADE EXPRESS REMITTANCE

EzRemit Money Transfer

NBL MONEY TRANSFER

cbl money transfer

INSTANT CASH GLOBAL MONEY TRANSFER

JRF

Ersal Money Transfer

ACE money transfer

Prabhu Express

xoom A PayPal Service

যে কারণে রূপালী ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠাবেন ঃ

- রূপালী ব্যাংক পিএলসি সকল নিয়ম কানুন মেনে ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে রেমিট্যান্স সেবা প্রদান করে।
- রূপালী ব্যাংক পিএলসি রাষ্ট্রমালিকানাধীন অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ব্যাংকের শাখা ও উপশাখার বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অতি দ্রুত প্রবাস থেকে রেমিট্যান্স দেশে পাঠাতে পারেন।
- বিশ্বের প্রায় ১৫০টি দেশ থেকে ৫০ টির অধিক পার্টনার এক্সচেঞ্জ হাউজের মাধ্যমে রূপালী ব্যাংকে সরাসরি রেমিট্যান্স প্রেরণের সুবিধা।
- ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে সরকারী প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদান।

বিকল্প চিন্তা না করে

এই মুহূর্তে আপনার প্রবাসী স্বজনকে তাদের কষ্টার্জিত অর্থ রূপালী ব্যাংক পিএলসি'র মাধ্যমে নিরাপদে ও দ্রুততম সময়ে দেশে পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করুন।
হুন্ডির মাধ্যমে টাকা প্রেরণ অবৈধ, ঝুঁকিপূর্ণ ও দেশের স্বার্থ পরিপন্থী।
ভিজিট করুন https://rupalibank.com.bd/remittance.php

রূপালী ব্যাংক পিএলসি
RUPALI BANK PLC
উত্তম সেবার নিশ্চয়তা

www.rupalibank.com.bd

শীতকালে উত্তর মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, চীন, রাশিয়া ও সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চল থেকে অতিথি পাখি আসে বাংলাদেশে; *ছবি : হাসান মাহমুদ*

জীবজন্তুদের শীতযাপন

আহমাদ মুদ্দাসসের

শীতে আমরা উষ্ণ কাপড়চোপড় পরে নিজেদের রক্ষা করি ঠান্ডা থেকে। কিন্তু প্রাণীরা কাপড় পরে না। তারা বিভিন্ন উপায়ে শীত যাপন করে। কোনো কোনো প্রাণী শীতনিদ্রায় চলে যায়, কোনোটি আবার গর্তে আশ্রয় নেয়, কেউ আবার শীতকালীন অঞ্চল ছেড়ে চলে আসে তুলনামূলক উষ্ণ দেশে। এ ছাড়া শীতযাপনের অদ্ভুত কিছু উপায় আছে প্রাণীদের। প্রাণ ও প্রকৃতির সেই অদ্ভুত সমন্বয়ের কথা...

Daily ePapers
BD
Click here to join the channel

২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বরের ঘটনা। যুক্তরাষ্ট্রের কানেটিকাটের অধিবাসী ভিনি ড্যাগুকেভিচ এক বিকেলে পরিবারের সঙ্গে বাড়ির পেছনের উঠানে সময় কাটাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিল তাঁদের তিন বছর বয়সী পিট বুল কুকুর ক্যালি। হঠাৎ ক্যালি অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করে। একটি উঁচু ডেক বা মেঝের কাছে গিয়ে বারবার গর্জন করছিল কুকুরটা। ক্যালি এমনিতে খুব মিষ্টি স্বভাবের কুকুর। তাই ওর এমন আচরণ দেখে অবাক হন ভিনি। একই সময়ে ভিনির প্রেমিকা অলিভিয়া চিৎকার করে বলেন, 'আমি একটা ভালুক দেখেছি!'

প্রথমে ভিনি বিশ্বাস করেননি। তিনি বাড়ির পেছনের জঙ্গলের দিকে তাকান। কিন্তু সেখানে কোনো প্রাণী দেখতে পাননি। তারপর ডেকের নিচে তাকিয়ে দেখলেন, একটি বড় কালো ভালুক। বেশ মোটাসোটা। গাছের পাতা আর ত্রিপলের বিছানার ওপর অলসভাবে আরাম করে শুয়ে আছে।

ভিনি টিকটকে ভালুকটির একটি ভিডিও পোস্ট করেন। ভিডিওটি তখন ১৫ লাখের বেশি বার দেখা হয়েছিল। পরিবারের সদস্যরা ভালুকটির নাম দিয়েছিলেন মার্টি বিয়ারনার্ড। এই ভালুকের জন্য একটি ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টও খুলেছিলেন তাঁরা। সেখানে 'বায়ো'তে লেখা ছিল, 'এখন আমি ঘুমাচ্ছি। হট বিয়ার সামারের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আগপর্যন্ত ঘুমাব।'

কানেটিকাট ডিপার্টমেন্ট অব এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ভিনি। এই প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁদের জানানো হয়, ভালুকটি সম্ভবত একটি পুরুষ কালো ভালুক। তাদের পরামর্শ ছিল, পরিবার চাইলে শব্দ বা অন্য কোনো উদ্দীপনা দিয়ে ভালুকটিকে সরিয়ে দিতে পারে, অথবা কয়েক মাস হাইবারনেশন শেষে ওটা নিজেই চলে যাবে।

বিশ্বজুড়ে এই কালো ভালুকের মতো শত শত প্রজাতির প্রাণী শীতকালটা এমন নিষ্ক্রিয়ভাবে ঘুমিয়েই কাটায়। প্রচলিত ইংরেজিতে বললে, 'হাইবারনেট' করে। অর্থাৎ শীতনিদ্রা যাপন করে। এ সময় এরা কিন্তু সত্যি সত্যি ঘুমায় না। ঠান্ডা আবহাওয়া ও খাদ্যের অভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। যেমন শজারু (হেজহগ), ভালুক ও বাদুড় শক্তি বাঁচাতে নিষ্ক্রিয় থাকে। শীতনিদ্রার সময় এদের হৃৎস্পন্দন ও শ্বাসপ্রশ্বাস ধীর হয়ে যায়। কমে যায় দেহের তাপমাত্রা। শীতনিদ্রা যাপনকালে ভালুক সহজেই জেগে উঠতে পারে। তবে দিনের পর দিন জেগে ওঠা, খাওয়া, পানি পান করা বা বাথরুম করা ছাড়াই টিকে থাকতে পারে এরা।

শীতকালীন দেশের অনেক প্রাণী শীতকালটা এ রকম বিভিন্ন উপায়ে কাটায়। এভাবে তারা শীতের মোকাবিলা করে। উত্তরের ঠান্ডা দেশের বনভূমির অসংখ্য পাখি শীতের ঠান্ডা ও খাদ্যাভাব এড়াতে দক্ষিণে চলে যায়। অন্য প্রাণীদের শরীরে ঠান্ডা আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য মোটা পশম বা পালক গজায়। আর কোনো কোনো প্রাণী শীতকালে নিষ্ক্রিয় থাকে, যা হাইবারনেশন বা শীতনিদ্রা নামে পরিচিত। শেষেরটির কথা তো শুরুতেই বলেছি।

দীর্ঘ শীতনিদ্রার প্রস্তুতি নিতে প্রাণীরা প্রচুর খাবার খায়। যেমন ডর মাউস এত খায় যে গ্রীষ্মের শেষে এদের শরীরের আকার দ্বিগুণ হয়ে যায়। এতে বেশ ভালোই হয়। কারণ, শীতনিদ্রার সময় এদের শরীরের ওজনের অর্ধেক হারিয়ে যেতে পারে।

> উত্তরের ঠান্ডা দেশের বনভূমির অসংখ্য পাখি শীতের ঠান্ডা ও খাদ্যাভাব এড়াতে দক্ষিণে চলে যায়

প্রাণীরা বিভিন্নভাবে শীতনিদ্রা যাপন করে। যেমন স্লেল বা শামুক কোনো একটি পৃষ্ঠে লেগে নিজের শ্লেষ্মা দিয়ে শরীর ঢেকে দিয়ে পুরো শীতকাল কাটিয়ে দেয়। অন্যদিকে শজারু ঘাস, পাতা ও খড় দিয়ে বাসা বানিয়ে পড়ে থাকে গাছের গুঁড়িতে।

তবে সব প্রাণী শীতে হাইবারনেট করে না। এর মধ্যে আছে গুইসাপ। এরা শীতনিদ্রা যাপন করে না। কারণ, শরীরে যথেষ্ট চর্বি জমাতে পারে না এরা। তাই গ্রীষ্মে এরা বিভিন্ন জায়গায় খাবার লুকিয়ে রাখে। শীতে দিনে ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত ঘুমায় এবং সকালে বা সন্ধ্যায় খাবার খুঁজতে বের হয়।

শীতের পাশাপাশি গরম ও শুষ্ক পরিবেশের কিছু প্রাণী 'অ্যাস্টিভেট' করে (কথাটির সঠিক বাংলা নেই। তবে একে চাইলে 'গ্রীষ্মকালীন ঘুম' বলা যেতে পারে!)। যেমন আফ্রিকান শজারু ও কুমির। কিছু প্রজাতির ক্যাটফিশও এই তালিকায় আছে। এরা গরম থেকে বাঁচতে ঠান্ডা ও নিরাপদ জায়গা খুঁজে বের করে সেখানে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে থাকে। এই অ্যাস্টিভেশন সাধারণত হাইবারনেশনের চেয়ে কম সময় ধরে চলে। এর অসাধারণ উদাহরণ দক্ষিণ আমেরিকার লাংফিশ। এটি আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায়। প্রাচীন মিঠাপানির মাছের এই প্রজাতি গরম ও শুষ্ক গ্রীষ্মে অ্যাস্টিভেট করে। বুঝতেই পারছেন, এটি হাইবারনেশনের বিপরীত। অর্থাৎ প্রাণীরা গরম আবহাওয়া থেকে বাঁচতে গরমকালে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে বা গ্রীষ্মকালীন ঘুম দেয়।

মৌসুমি খরা যখন লাংফিশের আবাসস্থলকে অনুপযুক্ত করে তোলে, তখন লাংফিশ পুকুর বা নদীর শুকিয়ে যাওয়া তলদেশের কাদার মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। এটি পরে নিজের চারপাশে একধরনের মিউকাস (Mucous) ক্ষরণ করে প্রতিরক্ষাবলয় তৈরি করে। মিউকাস স্তর মাছটিকে শুষ্কতা ও চরম তাপমাত্রা থেকে রক্ষা করে। এই মিউকাসের ভেতরে লাংফিশের বিপাকীয় হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। এতে লাংফিশ দীর্ঘ সময় প্রকৃতিতে

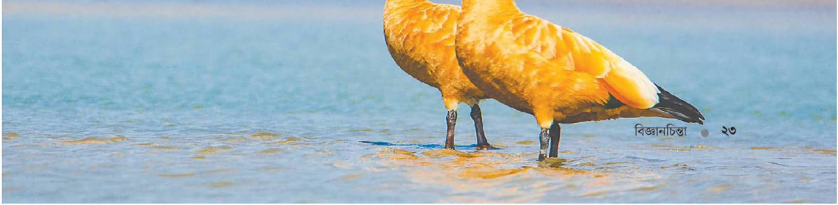

ভালুকের শীতযাপন;
ছবি : স-টুথ সোসাইটি

টিকে থাকার সুযোগ পায়, যতক্ষণ না পরিবেশ অনুকূল হয়। লাংফিশ একাধিক বছর পর্যন্ত অ্যাস্টিভেশনে থাকতে পারে।

সরীসৃপ, যেমন সাপ ও টিকটিকি ঠান্ডা সহ্য করার জন্য 'ক্রমেশনে' যায়। এরা কোনো খালি গর্তে গিয়ে ঠান্ডা সহ্য করে। কারণ, সরীসৃপ 'শীতল রক্তে'র প্রাণী। শীতল রক্ত মানে কিন্তু সত্যি সত্যি শীতল বা ঠান্ডা রক্ত নয়। এ কথা বলে বোঝানো হয়, এসব প্রাণীর নিজ দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণের কোনো অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা নেই। এদের শরীরের তাপমাত্রা পরিবেশ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। এদের খাদ্য, অনেক পোকামাকড় শীতকালে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। অনেক ব্যাঙ পোকামাকড় খেয়ে বেঁচে থাকে। শীতকালে পোকামাকড় কম থাকে বলে ব্যাঙের খাবারের অভাব হয়। টিকে থাকার জন্য ব্যাঙ তাই হাইবারনেশনে যায়।

কিছু প্রাণী একা একা হাইবারনেট করে। আবার গার্টার সাপ দল বেঁধে শত শত, এমনকি হাজার হাজার সাপ একটি গর্তে একত্রে হাইবারনেট করে। পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকায় এরা উষ্ণ থাকে। শীতল রক্তের প্রাণীদের জন্য এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

রুইসালো দ্বীপে পাওয়া দুটি সাপের প্রজাতি হলো কমন ইউরোপিয়ান অ্যাডার ও গ্রাস স্নেক। এরা শীতকালে হাইবারনেট করে। কমন ইউরোপিয়ান অ্যাডাররা সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে পাথুরে গর্ত ও মাটির নিচে এমন জায়গা খুঁজতে শুরু করে, যেখানে তারা নিজেদের শরীরের তাপমাত্রা যতটা সম্ভব স্থির রাখতে পারে।

সবচেয়ে জনপ্রিয় হাইবারনেশন স্থানগুলো প্রতিবছর ব্যবহার করা হয় এবং এতে ডজন ডজন, কখনো কখনো শত শত সাপ থাকতে পারে। একই গর্তে ব্যাঙেরাও হাইবারনেট করে, যদিও গ্রীষ্মকালে তারা সাপের শিকার হয়। উভচর ও সরীসৃপ প্রাণীদের হাইবারনেশনে প্রয়োজনে পরস্পরের জন্য জায়গা থাকে। গ্রাস স্নেক কমন ইউরোপিয়ান অ্যাডারের চেয়ে একটু আগে হাইবারনেশন শুরু করে। তারা সাধারণত তীরের কাছে পাথরের স্তূপ বা পাথুরে ফাটল পছন্দ করে।

উত্তর আমেরিকার এক প্রজাতির ব্যাঙ (Rana sylvatica বা কাঠব্যাঙ) শীতকালীন বরফে পুরোপুরি জমে গিয়ে ক্রমেশন করে, যাকে বলে কঠিন পদার্থ হয়ে যাওয়া। এরপরও এরা বেঁচে থাকে। একাধিকবার বরফ গলে বের হয়, আবার বরফে জমেও যায়। তাপমাত্রা যখন মাইনাস ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম হয়, তখন এদের দেহে ক্ষুদ্র বরফের স্ফটিক তৈরি হয়। এই বরফ দেহের প্রায় ৪০ শতাংশ তরল জমিয়ে ফেলে। কাঠব্যাঙের শরীর স্থবির অবস্থায় চলে যায়। সব বিপাকীয় কার্যকলাপ কার্যত বন্ধ হয়ে যায় এ সময়। জমে থাকার সময় কাঠব্যাঙের শরীরের তাপমাত্রা পরিবেশের সঙ্গে মিলে যায়। এই তাপমাত্রা প্রায়ই পানির হিমাঙ্কের নিচে পৌঁছে যায়। এই কঠিন অবস্থায় টিকে থাকতে এই ব্যাঙের অঙ্গ ও গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেমগুলোকে গ্লুকোজ ও ইউরিয়ার সমন্বয় রক্ষা করে। এই পদার্থগুলো কোষের ভেতরে বরফ জমতে বাধা দেয় এবং মারাত্মক কোষীয় ক্ষতির ঝুঁকি কমিয়ে ফেলে। এ ছাড়া কাঠব্যাঙের রক্তে উচ্চমাত্রার গ্লুকোজ থাকে, যা টিস্যুকে স্থিতিশীল রাখে এবং তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে। বসন্ত আসার সঙ্গে ব্যাঙের তাপমাত্রা উষ্ণ হওয়ার সময় কাঠব্যাঙ ধীরে ধীরে গলে যায় এবং স্বাভাবিক বিপাকীয় কার্যকলাপ পুনরায় শুরু করে।

আমাদের দেশে জলজ ও স্থলজ—দুই ধরনের ব্যাঙ প্রচুর দেখা যায়। শীতের সময়ে এদের তেমন দেখা যায় না। যেসব ব্যাঙ বেশির ভাগ সময় পানিতে থাকে, তারা পুকুর, নদী ও জলাশয়ের নিচের নরম কাদামাটির স্তরে ঢুকে পড়ে। শীতকালে পুকুরের এই স্তরে পানি তেমন ঠান্ডা হয় না। শীতের দেশে নিচের স্তরের পানির তাপমাত্রা কমে না। ফলে ব্যাঙ সেখানে নিরাপদে ঘুমায়। এটাই সেই শীতনিদ্রা। জলজ ব্যাঙ শীতনিদ্রার সময় ত্বকের মাধ্যমে অক্সিজেন গ্রহণ করে। মাটি বা পানির নিচে থাকলেও এভাবে এরা পর্যাপ্ত অক্সিজেন পায়। কটকটি ব্যাঙ এভাবে শীতনিদ্রা যাপন করে। একইভাবে স্থলজ ব্যাঙ বন, গাছের গুঁড়ি, পাথরের ফাঁকে বা মাটির ভেতরে গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে থাকে। যেমন কুনোব্যাঙ। শীতনিদ্রার সময় এরা রক্তে স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে ১০০ গুণ বেশি গ্লুকোজ ধরে রাখতে পারে।

শীতের দেশে অক্টোবরে যখন রাতের তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির কাছাকাছি নেমে আসে, তখন রুইসালো দ্বীপের ব্যাঙগুলো খাওয়া বন্ধ করে হাইবারনেশনের জায়গা খুঁজতে শুরু করে। স্মুথ নিউটের মতো উভচর প্রাণীরাও ছোট জলাশয়ের তলদেশের কাদা বা মাটির গর্তে হাইবারনেট করে।

সাপ-ব্যাঙের পাশাপাশি অনেক কচ্ছপ হাইবারনেট করে। তবে এটি প্রজাতি ও অবস্থান অনুযায়ী ভিন্ন হয়। বন্য কচ্ছপ ঠান্ডা অঞ্চলে বছরে তিন থেকে পাঁচ মাস পর্যন্ত হাইবারনেট

করতে পারে। এরা মাটির নিচে একটি গর্ত খনন করে, হৃৎস্পন্দন প্রতি মিনিটে ৫ থেকে ১০ বিটে নামিয়ে আনে এবং পুরোপুরি শ্বাস নেওয়া বন্ধ করে দেয়। তবে এরা অক্সিজেন ছাড়া থাকে না, ত্বকের মাধ্যমে অক্সিজেন গ্রহণ করে।

মানুষ এসব প্রাণীর মতো করে শীতকালে হাইবারনেট করতে পারে না। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এর কারণ আমাদের আকার। ভালুক ছাড়া বেশির ভাগ হাইবারনেট করা প্রাণী ছোট আকৃতির। সবচেয়ে বেশি সময় ধরে হাইবারনেট করে ডর্মাউস। এরা প্রায় ১১ মাস পর্যন্ত শীতনিদ্রা যাপন করে। আসলে 'ডর্মাউস' নামটি এসেছে ফরাসি শব্দ 'ডর্মির' থেকে, যার অর্থ 'ঘুমানো'।

আমাদের দেশে শীতকালেও প্রচুর মশা ও পোকামাকড় থাকে। এসব পোকা খেয়ে শীতে টিকে থাকে বাদুড়জাতীয় প্রাণী। শীতের দেশে তেমন পোকামাকড় থাকে না। এসব অঞ্চলে রাতে তাপমাত্রা কমে গেলে বা খাবার কমে গেলে বাদুড় 'টর্পর' অবস্থায় চলে যায়। এটি পুরোপুরি হাইবারনেশন নয়। বাদুরের সেসব প্রজাতিই শুধু হাইবারনেট করে, যাদের এলাকায় শীতকালে কীটপতঙ্গ পাওয়া যায় না। টর্পর বা হাইবারনেশনের সময় বাদুড় গুহার দেয়াল বা সিলিং থেকে ঝুলে থাকে এবং হৃৎস্পন্দন প্রতি মিনিটে ১০ বিটে নামিয়ে আনতে পারে।

শুধু প্রাণীদের মধ্যে হাইবারনেশন দেখা যায়, এমন নয়। পতঙ্গের মধ্যেও হাইবারনেশন আছে। ভোমরারাও হাইবারনেট করে। সব ভোমর অবশ্য হাইবারনেট করে না, তবে রানি ভোমরের জন্য এটি জীবন চক্রের অংশ। শীতের দেশে তাপমাত্রা কমে গেলে সব পুরুষ ও কর্মী ভোমর মারা যায়, রানি একটি উপযুক্ত জায়গা খুঁজে নিয়ে শীতকাল কাটিয়ে দেয়। তাপমাত্রা বাড়লে রানি বেরিয়ে আসে। একটি বাসা তৈরি করে এবং সম্পূর্ণ নতুন উপনিবেশ সৃষ্টি করে।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে হাইবারনেশন নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কারণ, কীভাবে প্রকৃত হাইবারনেশন চিহ্নিত করা হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন, কালো ভালুককে, যা দীর্ঘদিন ধরে হাইবারনেশনের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত—আসলে 'সত্যিকারের' হাইবারনেটর বলা যাবে না। বরং ভালুক 'টর্পর' (torpor) অবস্থায় প্রবেশ করে। টর্পর হাইবারনেশনের অনুরূপ, কিন্তু এক নয়। কারণ, এতে ভালুকের শরীরের তাপমাত্রা খুব বেশি কমে না।

তবে সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, শরীরের তাপমাত্রা সামান্য কমলেও হাইবারনেশন ঘটতে পারে। হাইবারনেশনের সংজ্ঞা শরীরের তাপমাত্রা পরিবর্তনের চেয়ে বিপাকীয় কার্যকলাপ কমে যাওয়ার ওপর বেশি নির্ভর করে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী, কালো ভালুক সত্যিকারের হাইবারনেটর। কারণ, এদের বিপাকীয় হার ২৫ শতাংশ হ্রাস পায় এবং হৃৎস্পন্দন প্রতি মিনিটে গড়ে ৫৫ থেকে ৯-তে নেমে আসে।

আমাদের দেশে শীতকালে প্রচুর আলোচনা হয় পরিযায়ী পাখি নিয়ে। আয়োজন করে মানুষ পাখি দেখতে বিভিন্ন জলাভূমিতে যান। দেশের বহু জলাভূমিতে শীতকালীন পরিযায়ী পাখি আসে। পৃথিবীতে প্রায় ১০ হাজার প্রজাতির পাখি আছে। এর মধ্যে গবেষকেরা ১ হাজার ৮৫৫ প্রজাতির পাখিকে 'পরিযায়ী' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রতিবছর বাংলাদেশে প্রায় ৩০০ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি আসে বলে পাখিবিশারদ ইনাম আল হক (২০২৩) জানিয়েছেন।

সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওর, মৌলভীবাজারের হাকালুকি হাওর, বাইক্কার বিল, বরিশালের দুর্গাসাগর, ভোলার চরগুলো, পাবনার চলনবিল, সুন্দরবনের নদ-নদী, নিঝুম দ্বীপ, ঢালচর, কুয়াকাটার চর, চর কুকরি-মুকরি, দুবলারচর, নীলফামারীর নীলসাগর, ঢাকার মিরপুরের চিড়িয়াখানার জলাশয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক ইত্যাদি স্থানে আসে পাখি।

বাংলাদেশে শীতের পাখি সবার আগে আসে কাশ্মীর ও হিমাচল থেকে। এই এলাকা থেকে আসে খঞ্জন ও সুইচোরা। আসে চ্যাগা ও চা পাখি। কিছুটা উত্তর-পূর্ব এলাকা লাদাখ, সিনকিয়াং ও তিব্বত থেকে আসে চখাচখি। তবে পূর্ব ইউরোপ থেকে আসে মানিকজোড়, গেওলা ও গুলিন্দা পাখি। সাইবেরিয়া ও মধ্য এশিয়া থেকে আসে রাজহাঁস ও নেরল হাঁস। হিমালয় পর্বত ডিঙিয়ে বিশাল পথ পাড়ি দিয়ে এরা আসে। উত্তর-পূর্বের মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়া থেকে আসে কালা সারস। এর কিছুটা দক্ষিণে চীন ও উত্তর মিয়ানমার থেকে আসে চোখে কাজল দেওয়া কসাই পাখি। শীতের দেশের এই পাখি ছাড়াও পশ্চিমের আরব সাগর ও আফ্রিকা থেকে আসে কানঠুটি, লাল পা ডেঙ্গা ও কাস্তেচরা। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে সাগরের পথ ধরে আসে গগনবেড়।

আইইউসিএনের তথ্যানুযায়ী, প্রতিবছর বাংলাদেশের স্বাদুপানির হাওর-বাঁওড়, বিল ও জলাশয়গুলোতে দুই লাখের বেশি হাঁস ও বিভিন্ন প্রজাতির পাখি বিচরণ করে, বিশেষ করে টাঙ্গুয়ার হাওর ও হাকালুকি হাওরে। এ ছাড়া আরও এক লাখের বেশি সৈকতপাখি আমাদের সামুদ্রিক অঞ্চলে বেড়াতে আসে।

আইইউসিএনের তথ্যানুযায়ী, প্রতিবছর বাংলাদেশের স্বাদুপানির হাওর-বাঁওড়, বিল ও জলাশয়গুলোতে দুই লাখের বেশি হাঁস ও বিভিন্ন প্রজাতির পাখি বিচরণ করে

আ গে মনে করা হ তো , রাশিয়া-

জলজ ব্যাঙ;
ছবি : মো : ফজলে রাব্বী

বাংলার সরিষা ক্ষেতে উড়ে বেড়াচ্ছে অতিথি পাখি; *ছবি : হাসান মাহমুদ*

সাইবেরিয়া থেকে পাখিগুলো আসে। কিন্তু এখন ভিন্নমত পাওয়া যাচ্ছে। পরিযায়ী পাখি-বিশেষজ্ঞ সারোয়ার আলম দীপু জানিয়েছেন, পাখিগুলো মূলত আসে উত্তর মঙ্গোলিয়া, তিব্বতের একটি অংশ, চীনের কিছু অঞ্চল, রাশিয়া ও সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চল থেকে। অর্থাৎ উত্তর মেরু, ইউরোপ ও এশিয়ার কিছু এলাকা ও হিমালয় পর্বতমালার আশপাশের এলাকা থেকেই পাখিগুলো দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ভারত ও বাংলাদেশে আসে, যেখানে তুলনামূলক কম ঠান্ডা পড়ে এবং খাবার পাওয়া যায়।

আবার মার্চের শেষ দিকে যখন এ অঞ্চলে গরম পড়তে শুরু করে এবং শীতপ্রধান এলাকায় বরফ গলা শুরু হয়, তখন আবার দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পাখিগুলো নিজ এলাকায় ফেরত চলে যায়।

পাখির অভিবাসন রহস্য নিয়ে এখন নতুন তথ্য জানাচ্ছেন গবেষকেরা। উষ্ণ আবহাওয়ায় শীত কাটানোর উপকারিতা নিয়ে প্রচলিত ধারণা ভেঙে যাচ্ছে এর ফলে। ব্ল্যাক বার্ডের হৃৎস্পন্দন পর্যবেক্ষণ করে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। জার্মানির গবেষকেরা ব্ল্যাক বার্ডদের শরীরে ক্ষুদ্র ইমপ্ল্যান্টেবল ডেটা লগার স্থাপন করেছিলেন, যা এদের শরীরের তাপমাত্রা ও হৃৎস্পন্দন সেপ্টেম্বর থেকে মে পর্যন্ত ৯ মাস ধরে রেকর্ড করেছিল। এটি অনেকটা পাখিদের ফিটনেস স্মার্ট ওয়াচ পরানোর মতো।

পাখিদের জন্য শরৎকাল নিয়ে আসে চ্যালেঞ্জ ও বিপদ। উষ্ণ শীতকালীন অঞ্চলে পৌঁছানোর জন্য অনেক পাখিকে শত শত বা হাজার হাজার মাইল উড়তে হয়। এতে প্রচুর শক্তি ব্যয় হয়, পাশাপাশি ঝড়, উঁচু ভবন এবং অন্যান্য বিপদ এড়াতে হয়। বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে মনে করতেন, একবার তুলনামূলক উষ্ণ অঞ্চলে পৌঁছে গেলে পাখিদের এত পরিশ্রম করতে হয় না উষ্ণ থাকার জন্য। ফলে অনেক শক্তি সঞ্চয় হয়। কিন্তু কেউ কখনো এটি পরীক্ষা করেনি, বলেছিলেন জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট অব অ্যানিমেল বিহেভিয়ারের বিহেভিয়ারাল ইকোলজিস্ট নিলস লাইনেক। ড. লাইনেক ও তাঁর সহকর্মীরা এটি পরীক্ষা করেছেন।

জার্মানির ব্ল্যাক বার্ডদের আংশিক অভিবাসনজনিত এক জনগোষ্ঠীর ওপর ভিত্তি করে তাঁদের গবেষণার ফলাফল প্রচলিত ধারণা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, শীতে দক্ষিণ ইউরোপ বা উত্তর আফ্রিকার উষ্ণ এলাকায় থাকা ব্ল্যাক বার্ডরা জার্মানিতে শীত কাটানো পাখিদের তুলনায় শক্তি কম ব্যয় করেনি।

গবেষণাটি *নেচার ইকোলজি অ্যান্ড ইভল্যুশন* জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। এ গবেষণায় দেখা গেছে, অভিবাসী পাখি শরতের যাত্রার প্রস্তুতি কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই শুরু করে। রাতে এরা বিপাক হার কমিয়ে শক্তি সঞ্চয় করত। এটি বোঝায়, অভিবাসন প্রক্রিয়া 'তত্ত্বের তুলনায় অনেক জটিল,' বলেন ড. লাইনেক।

গবেষকেরা দক্ষিণ জার্মানির বনাঞ্চলে বসবাসকারী সাধারণ ব্ল্যাক বার্ডদের নিয়ে গবেষণা করেছেন। বেশির ভাগ পাখি শীতকালে সেখানেই থাকে, কিন্তু প্রায় এক-চতুর্থাংশ পাখি অভিবাসন করে। অক্টোবর-নভেম্বরে দক্ষিণে উড়ে যায়। এরা দক্ষিণ ইউরোপ বা উত্তর আফ্রিকায় শীত কাটিয়ে এপ্রিলের শুরুর দিকে জার্মানিতে ফিরে আসে।

এই ডিভাইসগুলো প্রতি ৩০ মিনিট পরপর পাখিদের শরীরের তাপমাত্রা ও হৃৎস্পন্দন রেকর্ড করেছিল প্রায় ৯ মাস ধরে—সেপ্টেম্বর থেকে মে পর্যন্ত। হৃৎস্পন্দন শক্তি ব্যয়ের জন্য একটি সুপরিচিত সূচক; পাখি যত বেশি শক্তি ব্যবহার করে, তাদের হৃৎস্পন্দন তত বেশি হয়। গবেষকেরা ১১৮টি ব্ল্যাক বার্ডের শরীরে ডেটা লগার স্থাপন করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ৮৩টি পাখি পুনরুদ্ধার করে ডেটা ডাউনলোড করতে সক্ষম হন।

ডেটাগুলো নিশ্চিত করে যে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় প্রায় ৫০০ মাইলের গড় যাত্রার ফলে পাখিদের অতিরিক্ত শক্তি ব্যয় হয়। শীতকালে অভিবাসী পাখিদের হৃৎস্পন্দন স্থায়ী পাখিদের তুলনায় কম ছিল না। পুরো অভিবাসন চক্রজুড়ে উভয় গ্রুপ একই পরিমাণ শক্তি ব্যয় করেছিল।

উষ্ণ আবহাওয়ার অবশ্য সুবিধা আছে। গবেষকেরা হিসাব করেছেন, স্থানীয় আবহাওয়া পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রতিটি পাখির নিজ শরীরের তাপমাত্রা ধরে রাখতে কত শক্তি প্রয়োজন। অভিবাসী পাখিরা শীতকালে জার্মান পাখিদের তুলনায় সামান্য বেশি তাপমাত্রা ধরে রেখেছিল এবং এটি করতে তারা অনেক কম শক্তি ব্যয় করেছে। তবে সেই শক্তি তারা অন্য কোনো কাজে ব্যয় করছে, এটুকু স্পষ্ট। কিন্তু সেই কাজ কী, তা এখনো গবেষকেরা পুরোপুরি জানেন না।

লেখক : জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক, কিশোর আলো
সূত্র : সিএনএন, নিউইয়র্ক টাইমস, বিবিসি

আটটি উড়ালপথে বাংলায় আসে পরিযায়ী পাখি/ ইনামুল হক, প্রকৌশলী, চেয়ারম্যান, জল পরিবেশ ইনস্টিটিউট

কুল কুল প্রশ্ন গরম গরম উত্তর

ছবি : হাসান মাহমুদ

পেট্রোলিয়াম জেলি কী করে

শীতকালে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ কম থাকে। ত্বক সুস্থ ও আর্দ্র রাখতে আমাদের দেহ প্রতিনিয়ত কাজ করে। ত্বকে আর্দ্রতার জোগান দেয়। কিন্তু শীতকালে এই আর্দ্রতা শুষে নিতে থাকে বাতাস। ফলে ত্বক হয়ে ওঠে শুষ্ক। এ কারণে ত্বকের ওপরের স্তরে থাকা মৃত কোষের সুরক্ষা আস্তরণ ভেঙে পড়ে। একটা সময় ত্বকের নিচের স্তরেও ছড়িয়ে পড়ে ক্ষত। আমরা বলি, ত্বক ফেটে গেছে। খেয়াল করলে দেখবেন, এখানে ত্বক ফেটে যাওয়ার একমাত্র কারণ, এর আর্দ্রতা কমে যাওয়া। ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখা গেলে শীতে ত্বকের ফেটে যাওয়া রোধ করা সম্ভব। আর সেই কাজই করে পেট্রোলিয়াম জেলি। আমাদের ত্বকের ওপর আরেকটি স্তর তৈরি হয় পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করলে। অতিরিক্ত এই স্তর ত্বকের আর্দ্রতাকে পরিবেশের সঙ্গে মিশে যেতে বাধা দেয়। ত্বকের নিজস্ব আর্দ্রতা ত্বকের কাছেই থাকে। ফলে শুষ্ক বাতাসে তখন আর ত্বক ফেটে যায় না।

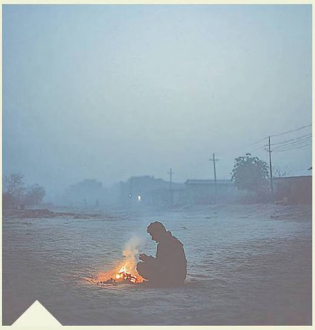

শীতকালে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে যায় কেন

বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কেমন হবে, তা মূলত তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে। তাপমাত্রা বেশি থাকলে বাতাসের গ্যাসীয় অণুগুলোর বেগ অনেক বেশি হয়। গ্যাসীয় অণুর মূল গড় বর্গবেগ (Root-mean-square-velocity) সূত্র থেকে তাপমাত্রা ও অণুর গতিবেগ সম্পর্কে জানা যায়। এই উচ্চগতির কারণে জলীয় বাষ্পের অণুগুলো বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় সহজেই তরল থেকে গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। শীতকালে তাপমাত্রা কমে গেলে এই গতি অনেক কমে যায়। তখন জলীয় বাষ্পের অণুগুলো ধীরে চলতে শুরু করে; অর্থাৎ তাপমাত্রা কমার ফলে বাষ্পীভবনের হার কমে যায়, বেড়ে যায় ঘনীভবনের হার। ফলে বাতাসে জলীয় বাষ্পের অণুর সংখ্যা, তথা আর্দ্রতা কমে যায়।

কিন্তু কিছু জলীয় বাষ্প তো থাকে, সেগুলোর কী হয়? নিয়মিতভাবে এ জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে কুয়াশা ও শিশিরের মতো অপেক্ষাকৃত বড় পানির কণায় পরিণত হয়। এতে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আরও কমে গিয়ে বাতাস শুষ্ক হয়ে যায়।

গ্লিসারিন কেন ত্বকে মাখি

গ্লিসারিন ত্বকে প্রাকৃতিক আর্দ্রতাকারক হিসেবে কাজ করে। পরিবেশ থেকে আর্দ্রতা শোষণ করে ত্বকের বাইরের স্তরে পাঠায়। এতে ত্বক আর্দ্র থাকে। শুষ্ক ত্বকের জন্য গ্লিসারিন তাই বেশ উপকারী।

বাতাস খুব শুষ্ক হলে গ্লিসারিন ত্বকের নিচের স্তর থেকে আর্দ্রতা শোষণ করে ওপরের স্তরকে আর্দ্র করার চেষ্টা করে। এতে সামগ্রিকভাবে ত্বক আরও শুষ্ক হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। আর শীতকালে যে বাতাসে আর্দ্রতা কম থাকে, তা বলা বাহুল্য। তাই গ্লিসারিন শীতকালে ব্যবহারের আগে পানি মেশানোর ওপর জোর দেন বিশেষজ্ঞরা। এতে মিশ্রিত পানি থেকেই ত্বকে আর্দ্রতা তৈরি করতে পারে গ্লিসারিন। ত্বকও চটচটে হয় না; বরং সঠিক আর্দ্রতা পেয়ে হয়ে ওঠে কোমল ও মসৃণ।

শীতে কেন সর্দি-কাশি বেশি হয়

শীতকালে সর্দি বেশি হয়, এ কথা ঠিক। তবে শীতের সঙ্গে সর্দি বা 'ঠান্ডা লাগা'র সরাসরি সম্পর্ক নেই। ঠান্ডা লাগা বা সর্দি বলতে আমরা যা বুঝি, সেটা হয় ভাইরাসের আক্রমণে। রাইনোভাইরাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা এ, করোনা ইত্যাদি ভাইরাস এ জন্য দায়ী। শীতকালে স্বাভাবিকভাবেই মানুষ ঘরের পরিবেশে বেশি সময় কাটায়। সেখানকার বাতাস খুব একটা বদলায় না। একই বাতাসে অনেক মানুষ শ্বাস নেয়। ফলে কেউ হাঁচি দিলে সেই জীবাণুও বাতাসে থেকে যায় দীর্ঘ সময়।

অন্যদিকে ঠান্ডা আবহাওয়ায় বাতাস শুষ্ক থাকে। ফলে মানুষের শ্বাসনালির শ্লেষ্মা বা মিউকাস শুকিয়ে যায়। দুর্বল হয়ে যায় প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। এ ছাড়া সিজনাল বা ঋতুনির্ভর ঠান্ডায় মানুষ আক্রান্ত হয় মূলত রাইনোভাইরাসের কারণে। ৩৩-৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এরা সবচেয়ে ভালোভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে। আমাদের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শীতল আবহাওয়ার কারণে শ্বাসনালির ত্বকের আবহাওয়া সামান্য কমে গেলে ভাইরাসের জন্য তা আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ায়। এতে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় দ্রুতবেগে আক্রমণ করতে পারে রাইনোভাইরাস। ফলে বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় শীতে বেশি সর্দি হয় বা ঠান্ডা লাগে।

পশমি কাপড় কীভাবে ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচায়

শীতের হাত থেকে বাঁচাতে পশমি কাপড়ের জুড়ি মেলা ভার। এটা আমাদের শরীরে বাড়তি কোনো উষ্ণতা যোগ করে না, বরং দেহে যে তাপ উৎপন্ন হয়, সেটাকে পরিবেশে যেতে বাধা দেয়। তাপগতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র আমাদের বলে, বেশি তাপমাত্রার বস্তু থেকে কম তাপমাত্রার বস্তুতে তাপ স্থানান্তরিত হয়। শীতকালে আমাদের দেহের চেয়ে পরিবেশের তাপমাত্রা কম থাকে। তাই দেহের উৎপাদিত তাপ পরিবেশে স্থানান্তর হতে চায়।

পশমি কাপড়ের বুনন সাধারণ কাপড়ের মতো মসৃণ হয় না। ছোট ছোট অসংখ্য কোঁকড়ানো তন্তু দিয়ে তৈরি এ কাপড়ের সুতা। এর ফলে পশমি কাপড়ের বুনন সাধারণ কাপড়ের মতো আঁটসাঁটও হয় না। কোঁকড়ানো তন্তুর মধ্যে থাকে ফাঁকা স্থান। এই ফাঁকা স্থান ভরা থাকে বাতাস দিয়ে। উলের কঠিন তন্তুতে থেকে পরমাণুর ঘন সন্নিবেশ, তারপর বাতাসের হালকা পরমাণুর আস্তরণ। দুইয়ে মিলে একটা অদ্ভুত পরিবেশ তৈরি করে। তখন তাপের পরিবহন বা পরিচলন— কোনো পদ্ধতিই সুবিধা করতে পারে না। এর ফলে পশমি কাপড় কাজ করে তাপ কুপরিবাহী হিসেবে। দেহের তাপ তখন আর বাইরে যায় না। নিজের তাপেই দেহ উষ্ণ থাকে।

ঠান্ডায় দাঁত ঠোকাঠুকি করে কেন

আমাদের মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস অংশ দেহের তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ করে। দেহের তাপমাত্রা কমে গেলেই এটা ত্বকের রোমকূপে সংকেত পাঠায়। সেখানকার পেশি তখন সংকুচিত হয়ে যায়। এতে যেমন শরীরে অতিরিক্ত তাপ তৈরি হয় কিছুটা, তেমনি রোমগুলো দাঁড়িয়ে যায়। যাঁদের দেহে রোমের পরিমাণ কম, তাঁদের এতে হয়তো খুব একটা উপকার হয় না, কিন্তু রোমশ দেহে এতে ত্বক এবং পরিবেশের মধ্যে একটি তাপের কুপরিবাহী স্তর সৃষ্টি হয়। এর ফলে দেহের তাপ বাইরে যেতে অনেকটাই বাধা পায়। কিছুটা উষ্ণ থাকে শরীর। তবে এটুকুতেই মস্তিষ্ক থেমে যায় না, শরীরের তাপের উৎপাদন বাড়াতে এরপর শরীরের বিভিন্ন পেশিকে সংকোচন প্রসারণের নির্দেশ পাঠায়। এ পর্যায়ে আমরা শরীরে কাঁপুনি অনুভব করি। শীতের তীব্রতা যত বেশি হয়, তত বেশিসংখ্যক পেশির বেশি শক্তি খরচ করে সংকোচন-প্রসারণ হতে চায়। একটা সময় আমাদের মুখের চোয়ালের পেশিগুলোও এভাবে কাঁপা শুরু করে। তখনই দাঁতে দাঁত বাড়ি খায়। দাঁত ঠকঠক করে। এটি খুবই স্বাভাবিক একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে দেহ নিজের তাপ বাড়ানোর চেষ্টা করে ঠিকই, এর পাশাপাশি আমাদের সতর্কবার্তা দেয়। যেন বলতে চায়, 'তোমার দেহ শীতে আক্রান্ত। তাপ ধরে রাখার জন্য দ্রুত কিছুটা একটা করো।'

শীতে বেশি সবজি জন্মে কেন

বাংলাদেশে শীতকালে যেসব শাকসবজি জন্মে, তার প্রায় সবই লতা-গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। এসব উদ্ভিদ প্রখর রোদের আলোতে ঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ নিজের খাবার তৈরি করে। এ জন্য মাটি থেকে প্রয়োজনীয় পানি ও পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ করে বাতাস থেকে নেয় কার্বন ডাই-অক্সাইড। এরপর পাতার কোষে থাকা ক্লোরোপ্লাস্টে সূর্যের আলোর সাহায্য নিয়ে এসব উপাদান ভেঙে তৈরি হয় গাছের খাবার। সব উদ্ভিদ সমান তীব্রতার সূর্যের আলো গ্রহণ করতে পারে না। গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ প্রখর আলোতে পুড়ে যেতে পারে। তাই এদের দরকার কোমল আলো, সেটাও বেশি সময়ের জন্য নয়। শীতকালে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের বিপরীতে ২৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি হেলে থাকে। এর ফলে সূর্যের আলো সরাসরি খাড়াভাবে না পড়ে তির্যকভাবে পড়ে। এতে আলো ও তাপের তীব্রতা অনেক কম থাকে। এই আলো শাকসবজি-জাতীয় উদ্ভিদের জন্য উপযোগী। কারণ, দিনের দৈর্ঘ্যও এ সময় কম থাকে। এ ছাড়া তাপমাত্রা কম থাকার কারণে কুয়াশা ও শিশির জমে মাটি থাকে আর্দ্র। গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ তার ছোট অগভীর শিকড় দিয়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণ সহজেই টেনে নিতে পারে। বেশির ভাগ পোকামাকড় শীতল রক্তের হওয়ায় (অর্থাৎ দেহের নিজস্ব তাপ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা না থাকায়) এসব পোকামাকড়ের উপদ্রব তুলনামূলক কম থাকে। সব মিলিয়ে শাকসবজি জন্মানোর জন্য যে পরিবেশ দরকার, তার পুরোটাই পাওয়া যায় শীতকালে। আর এ কারণেই শীতকালে হাটে-মাঠে দেখা মেলে রংবেরঙের শাকসবজির।

শৈত্যপ্রবাহ কেন হয়

সংস্কৃত ভাষায় 'শৈত্য' শব্দ দিয়ে শীত আর 'প্রবাহ' শব্দের অর্থ তো আমরা জানিই, 'বয়ে চলা'। সেদিক থেকে শীতল বাতাসের প্রবাহকে শৈত্যপ্রবাহ বলা যায়। তবে আবহাওয়াবিজ্ঞানে শৈত্যপ্রবাহ বলতে আবহাওয়ার একটি বিশেষ অবস্থাকে বোঝায়। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা বলছে, ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে পরিবেশের তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কমে ওই অঞ্চলের গড় সর্বনিম্ন অবস্থায় গেলে সেটাকে শৈত্যপ্রবাহ বলা যায়। অঞ্চলভেদে এই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমবেশি হয়। বাংলাদেশের জন্য ডিসেম্বর, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামলে তাকে শৈত্যপ্রবাহ বলা হয়। তবে এখানেও কিছু শর্ত আছে। ১০ ডিগ্রি বা তার নিচের তাপমাত্রা কমপক্ষে ৩ দিন স্থায়ী হতে হবে। তিন দিনের কম হলে, তাপমাত্রা কমে গেলেও সেটাকে শৈত্যপ্রবাহ হিসেবে ধরা হয় না; অর্থাৎ শীতকালে বাংলাদেশে তাপমাত্রা ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে ১০ ডিগ্রি বা তার কম হলে সেটা যদি কমপক্ষে তিন দিন স্থায়ী হয়, তাহলেই একে শৈত্যপ্রবাহ বলা হবে।

শীতকালে বাংলাদেশে বরফ পড়ে না কেন

শুরুতে জানতে হবে, তুষারপাত কী? সূর্যের তাপে সাগর, নদী, খাল-বিল বা পুকুরের পানি বাষ্পীভূত হয়ে ওপরে উঠে যায়। পানি বাষ্পীভূত হয়ে ওপরে ওঠার একটা কারণ আছে। সাধারণত যে বস্তু তুলনামূলক হালকা, তা ওপরের দিকে উঠতে চায়। জলীয় বাষ্প বাতাসের চেয়ে হালকা। তাই ওপরে উঠে যায়। যত ওপরের দিকে যাওয়া যাবে, তাপমাত্রাও তত কমবে। অবশ্য ওপরে ওঠারও একটা সীমা আছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১১ কিলোমিটার ওপরে যাওয়ার পর বাতাসে জলীয় বাষ্পের ধারণক্ষমতা কমে যায়। এই অঞ্চলকে বলে ক্ষুব্ধমণ্ডল বা ট্রপোমণ্ডল, ইংরেজিতে ট্রপোস্ফিয়ার (Troposphere)। এটা বায়ুমণ্ডলের একটা স্তর। এ অঞ্চলের বায়ুতে প্রচুর ধূলিকণা। জলীয় বাষ্পের সঙ্গে ধূলিকণা মিশে তা ভারী হয়ে যায়। ধীরে ধীরে তাপমাত্রা আরও কমলে পরিণত হয় তুষারে। বাতাসের তুলনায় এ তুষার আরও ভারী হয়ে যায়। বাতাস আর সেগুলো ধরে রাখতে পারে না। তখন তুষারকণা ঝরে পড়ে ভূপৃষ্ঠে।

তবে সেই তুষারকণা বাংলাদেশে পড়ে না। কারণ, আমাদের দেশের তাপমাত্রা কখনো হিমাঙ্কের নিচে নামে না। কখনো দেশের তাপমাত্রা যদি শূন্য ডিগ্রির নিচে নামে, তাহলে বরফ পড়তে পারে। এখন পর্যন্ত দেশে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২০১৮ সালে তেঁতুলিয়ায়, ২ দশমিক ৬ ডিগ্রি। তবে গবেষকদের মতে, ২০৩০ সাল নাগাদ পঞ্চগড়ের দিকে হালকা তুষারপাত হলেও হতে পারে।

শীতকালে বৃষ্টি কম হয় কেন

সাধারণত শীতকালে বৃষ্টি হতে দেখা যায় না। কারণ, তাপমাত্রার পরিবর্তন। শীতকালে পরিবেশের তাপমাত্রা কম থাকে। ফলে মেঘের মধ্যে থাকা জলীয় বাষ্প ঘনীভবন প্রক্রিয়ায় বরফ বা তুষারে পরিণত হয়। ঘনীভবন মানে, যে প্রক্রিয়ায় গ্যাস বা বাষ্প ঘন হয়ে তরলে পরিণত হয়। এ কারণে অনেক দেশে বরফ বা তুষারপাত বেশি দেখা যায়। ফলে বৃষ্টি হয় না। এ ছাড়া শীতকালে বাতাস সাধারণত শুষ্ক ও ঠান্ডা থাকে। মানে আর্দ্রতা বা জলীয় বাষ্প কম থাকে। কিন্তু বৃষ্টি হওয়ার জন্য মেঘে জলীয় বাষ্পের ঘনত্ব বেশি হতে হয়। তখনই কেবল মেঘ ভারী হয়ে ঝরে পড়ে ফোঁটায় ফোঁটায়, অর্থাৎ বৃষ্টি হয়। কিন্তু বৃষ্টি হওয়ার জন্য বাতাসে যদি প্রয়োজনীয় জলীয় বাষ্প না-ই থাকে, তাহলে মেঘ ভারী হবে কীভাবে? তাই বৃষ্টিও হয় না। তার ওপর শুষ্ক বাতাস মেঘের মধ্যে থাকা জলীয় বাষ্প শুষে নেয়; অর্থাৎ মেঘের জলীয় বাষ্পের ঘনত্ব এটি আরও কমিয়ে দেয়। ফলে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আরও কমে যায়।

শীতকালের ঠান্ডা বাতাস, কম আর্দ্রতা আর মেঘ তৈরি হওয়ার অনুকূল পরিবেশের অভাব—এই তিনে মিলে বৃষ্টির পথ বন্ধ করে দেয়। তবে একেবারে যে বৃষ্টি হয় না, তা নয়। মাঝেমধ্যে কোনো কোনো জায়গায় শীতকালেও বৃষ্টি হতে পারে, বিশেষ করে যদি ঝোড়ো আবহাওয়া বা কোনো বড় নিম্নচাপ তৈরি হয়। তবে সাধারণত সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলগুলোতেই এমনটা হতে দেখা যায়।

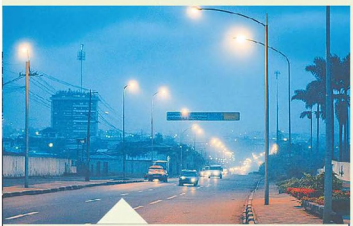

কুয়াশা কীভাবে তৈরি হয়

কুয়াশা মানে পানির ছোট ছোট কণার মেঘ। অবশ্য এই মেঘ আকাশে ভাসে না, বরং মাটির কাছাকাছি থাকে। বাতাসে থাকা পানির কণা ঠান্ডা হয়ে ছোট পানির কণায় পরিণত হলে কুয়াশা তৈরি হয়।

রাতে মাটি খুব ঠান্ডা হয়ে গেলে মাটির কাছাকাছি থাকা বাতাসও ঠান্ডা হয়ে যায়। ঠান্ডা বাতাস বেশি পানির বাষ্প ধরে রাখতে পারে না। তখন সেই বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ক্ষুদ্র পানির ফোঁটায় পরিণত হয়। এগুলোই কুয়াশা হিসেবে ভেসে বেড়ায়।

বাতাস বেশি থাকলে কুয়াশা তৈরি হতে পারে না। কারণ, বাতাস তখন পানির কণাগুলো উড়িয়ে দেয়। তবে আকাশ পরিষ্কার থাকলে এবং বাতাসে আর্দ্রতা বেশি হলে কুয়াশা ঘন হয়ে যায়। এ কারণে পাহাড়ি এলাকায় বা নদীর ধারে কুয়াশা বেশি দেখা যায়। সেখানে বাতাস ঠান্ডা হতে সময় লাগে না। ভোরবেলা বা শীতকালে কুয়াশা বেশি দেখা যায়। কারণ, তখন বাতাস খুব ঠান্ডা থাকে।

শীতকালে গরম, নাকি ঠান্ডা পানিতে গোসল করা ভালো

শীতকাল এলেই অনেকের মধ্যে গোসল করার অনীহা দেখা যায়। অনেকেই ভাবেন, শীতে গোসল না করলেই ভালো! কেউ কেউ এক-দুই দিন পরপর গোসল করেন। তবে শীতকালেও প্রতিদিন গোসল করতে পারলে ভালো। এতে শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেমন পানি দিয়ে গোসল করব?

শীতকালে হালকা গরম পানিতে গোসল করা বেশি ভালো। কারণ, শীতের সময় আমাদের শরীর থাকে ঠান্ডা। এই অবস্থায় গরম পানি শরীরকে আরাম দেয়। ঠান্ডা দূর হয় এবং শরীরও গরম হয়ে যায়। এতে সর্দি-কাশির ঝুঁকি কমে।

গরম পানিতে গোসল করলে শরীরের পেশি আর ত্বকের উপকার হয়। শীতে অনেকের ত্বক শুকিয়ে যায় বা চুলকায়। গরম পানি ত্বককে মোলায়েম করতে সাহায্য করে। তবে খুব বেশি গরম পানি দিয়ে গোসল করলে ত্বক শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। তাই হালকা গরম পানি ব্যবহার করাই ভালো।

অনেকে শীতকালে ঠান্ডা পানিতেও গোসল করেন। কিন্তু যাঁদের হার্ট বা ফুসফুসে সমস্যা আছে, তাঁদের ঠান্ডা পানিতে গোসল না করাই ভালো। এতে শরীরের তাপমাত্রা হঠাৎ কমে যেতে পারে। সঙ্গে সর্দি-কাশির সমস্যা তো রয়েছেই।

শেষ কথা হলো, শীতকালে হালকা গরম পানিতে গোসল করা ভালো। বেশি গরম পানিতে ত্বকের ফলিক নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। মুখের চামড়া থাকে খুব সংবেদনশীল, সেখানে বেশি গরম পানি লাগলে পুড়ে যেতে পারে ত্বক। তাই গোসলের সময় হালকা গরম পানি ব্যবহার করতে পারেন।

শীতকালে হাত-পা লালচে বা নীলচে হয়ে যায় কেন

শীতকালে অনেকের হাত-পা লালচে হয়ে যায়। কেন এমন হয়? আসলে আমাদের শরীরের ভেতরে সব সময় চলে রক্তপ্রবাহ। মানে রক্ত সারা শরীরে ঘুরে বেড়ায়। এই রক্ত শরীরের প্রতিটি কোষে অক্সিজেন আর পুষ্টি পৌঁছে দেয়। শীতকালে যখন খুব ঠান্ডা পড়ে, তখন শরীর নিজেকে গরম রাখার জন্য কাজ করে। শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেমন হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, ফুসফুস ইত্যাদি সব সময় উষ্ণ রাখতে হয়। শরীর এসব অংশে বেশি রক্ত সরবরাহ করার জন্য হাত-পা বা কানে রক্ত সরবরাহ কমিয়ে দেয় বাধ্য হলে। আর রক্ত কম পৌঁছালে ত্বকের রং বদলে যায়। তখনই হাত-পা লালচে বা নীলচে রঙের দেখায়। লাল রং হয় কারণ, ঠান্ডায় ত্বকের নিচে রক্ত জমা হতে থাকে। আর রক্তে অক্সিজেন কম থাকলে নীলচে দেখায়।

বেশি সময় এমন হলে সমস্যা হতে পারে। অনেক সময় ত্বক খুব ঠান্ডা হয়ে গেলে ঝিনঝিন করতে পারে বা অনুভূতিও কমে যেতে পারে। তাই ঠান্ডায় হাত-পা গরম রাখতে মোজা, গ্লাভস বা গরম কাপড় পরা জরুরি।

হাত-পা লালচে বা নীলচে হয়ে গেলে গরম পানিতে কিছুক্ষণ হাত-পা ডুবিয়ে রাখা যেতে পারে। এতে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হবে। এতেও সমস্যার সমাধান না হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উত্তম।

শীতকালে কি কাপড় দ্রুত শুকায়

হ্যাঁ, শীতকালে কাপড় দ্রুত শুকায়। কারণ, বাতাসের আর্দ্রতা। শীতকালে বাতাসের আর্দ্রতা থাকে কম। বাতাস কতটা ভেজা, তা বোঝা যায় আর্দ্রতার সাহায্যে। তবে বাতাসে পানি থাকে জলীয় বাষ্প আকারে। নদ-নদী বা সমুদ্র থেকে বাতাস এই পানি শোষণ করে। পানি শোষণেরও একটা সীমা আছে। বাতাস চায় সব সময় শতভাগ পানি শোষণ করে সম্পৃক্ত অবস্থায় থাকতে। কিন্তু সেই অবস্থায় যাওয়ার আগেই তা বৃষ্টি আকারে ঝরে পড়ে। যেহেতু শীতকালে বাতাসের আর্দ্রতা কম থাকে, তাই ভেজা কাপড় থেকে বাতাস দ্রুত পানি শোষণ করতে পারে। এ জন্য শীতকালে কাপড় দ্রুত শুকায়।

বিজ্ঞানচিন্তা ডেস্ক

কাশির লজেন্সের রসায়ন

গলা খুসখুস, গলাব্যথা, হালকা কাশিসহ নানা সমস্যা থেকে স্বস্তি দিতে পারে 'থ্রোট লজেন্স' বা কাশির লজেন্স। কীভাবে কাজ করে এটি? চলুন দেখে নিই একনজরে।

গলা খুসখুস প্রতিরোধে

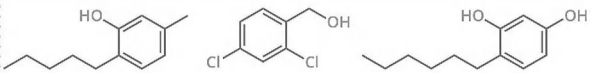

অ্যামাইলমেটাক্রেসল, ডাইক্লোরোবেনজাইল অ্যালকোহল এবং হেক্সাইলরেজোরসিনল (বাঁ থেকে ডানে)

গলাব্যথা বা খুসখুস প্রতিরোধী নানা ধরনের লজেন্স পাওয়া যায়। বাসে, পথে-ঘাটে, বিভিন্ন দোকানে বিক্রি হয় এসব ওষুধ। এগুলোকে চলতি ভাষায় অনেকেই 'কাশির ওষুধ' বলেন। এতে সাধারণত অ্যামাইলমেটাক্রেসল ও ডাইক্লোরোবেনজাইল অ্যালকোহল কিংবা দুটোই থাকে। এগুলোর একধরনের অ্যান্টিসেপটিক প্রভাব আছে। ব্যাকটেরিয়া (এবং কিছু কিছু ভাইরাসের সংক্রমণ) প্রতিরোধে কাজ করে এটি। কিছু লজেন্সে হেক্সাইলরেজোরসিনল ব্যবহার করা হয়। এর একধরনের চেতনানাশক প্রভাব আছে। গলাব্যথায় স্বস্তি দিলেও এগুলো আদৌ সংক্রমণের ব্যাপ্তি কমিয়ে আনে, এর পক্ষে-বিপক্ষে দুই ধরনের প্রমাণই আছে।

কাশির লজেন্স কীভাবে গলাব্যথা প্রতিরোধ করে

কাশির লজেন্স গ্রহণ | সোডিয়াম চ্যানেল ব্লক | গলাব্যথা কমে যাওয়া

চেতনানাশক প্রভাবের পাশাপাশি ধারণা করা হয়, এই তিন রাসায়নিক সোডিয়াম চ্যানেল বন্ধ করে দিতে পারে। এর ফলে মস্তিষ্কে ব্যথার সিগন্যাল পৌঁছাতে পারে না। এর ফলেই এগুলোর চেতনানাশক প্রভাব দেখা যায়।

অন্য যৌগ

অন্য অনেক যৌগ থাকতে পারে এসব লজেন্সে, এর কিছু কিছু স্বাদের জন্য ব্যবহৃত হয়। এর ফলে লজেন্স হয় সুস্বাদু। আবার মেনথল ব্যবহার করা হয় অনেক সময়, এর ফলে ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে। তার ওপর এগুলোর চেতনানাশক বৈশিষ্ট্য তো রয়েছেই। ডিকনজেস্ট্যান্ট ও কাশ প্রতিরোধী প্রভাবও উপাদান যৌগ বাছাইয়ে ভূমিকা রাখতে পারে।

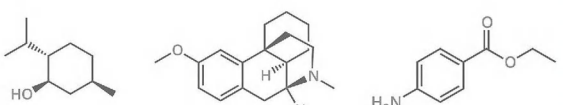

মেনথল, ডেক্সট্রোমিথোরফান (কফরোধী) এবং বেনজোকেইন (চেতনানাশক) (বাঁ থেকে ডানে)

গ্রন্থনা : বিজ্ঞানচিন্তা ডেস্ক, সূত্র : কম্পাউন্ড কেমিস্ট্রি

কী ও কেন?

লাই-ফাই প্রযুক্তি কীভাবে কাজ করে

আব্দুল কাইয়ুম আঁকা : **অনিন্দ্য মুস্তাসির**

তার মানে, তোমরা সব সময় ওয়াই-ফাই ব্যবহার করছ, অথচ লাই-ফাই জানো না?
ফেসবুকে তোমাদের বন্ধু কত?
হাজার হাজার, স্যার!
অর্থাৎ হরদম ওয়াই-ফাই ব্যবহার করছ। লাই-ফাই সে রকমই একধরনের ডিজিটাল ব্যবস্থা।
একটু বুঝিয়ে বলুন, স্যার।
রেডিও ওয়েভ ব্যবহার করে লোকাল নেটওয়ার্কে সংযোগ সাধন বা ইন্টারনেট যোগাযোগের একটি ব্যবস্থা হলো ওয়াই-ফাই। মডেম বা রাউটার ব্যবহার করে মোবাইল-কম্পিউটারে সিগন্যাল আদান-প্রদানের মাধ্যমে এই যোগাযোগ করা হয়।
ওয়াই-ফাই হলো তারহীন রেডিও ওয়েভের মাধ্যমে সংকেত গ্রহণ, ধারণ ও প্রেরণের উচ্চ মানের দক্ষতাসম্পন্ন প্রযুক্তি। অবশ্য এই ওয়াই-ফাই রাউটার বা মডেম ফাইবার অপটিক কেবল নামের বিশেষ তার দিয়ে ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত থাকে।
আর রেডিও সিগন্যাল ব্যবহার না করে লাইট বা আলোর মাধ্যমে সংকেত আদান-প্রদান করে লাই-ফাই।
অন্যদিকে এলইডি প্রযুক্তি আলোক তরঙ্গের মাধ্যমে সংকেত আদান-প্রদান করে। ওয়াই-ফাইয়ের চেয়ে এটা বেশি গতিসম্পন্ন। কম খরুচে ও সহজে ব্যবহার করা যায়।

চন্দ্রজয়ী প্রথম নারী

পর্ব : ৬

ব্রাড গান ও স্টিভেন লিস্ট | ভাষান্তর : কাজী আকাশ
আঁকা : ব্রেন্ট ডোনোহোর ও কেইটলিন রিড

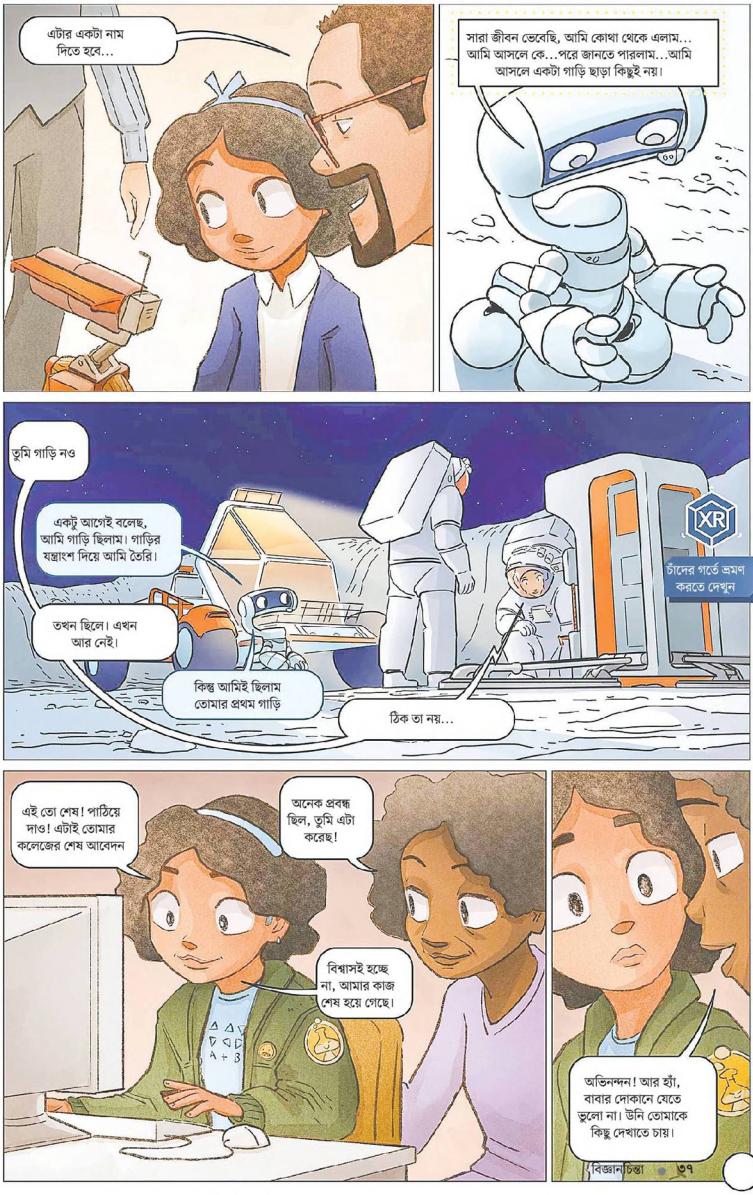
এটার একটা নাম দিতে হবে...
সারা জীবন ভেবেছি, আমি কোথা থেকে এলাম... আমি আসলে কে...পরে জানতে পারলাম...আমি আসলে একটা গাড়ি ছাড়া কিছুই নয়।
তুমি গাড়ি নও
একটু আগেই বলেছে, আমি গাড়ি ছিলাম। গাড়ির যন্ত্রাংশ দিয়ে আমি তৈরি।
তখন ছিলে। এখন আর নেই।
কিন্তু আমিই ছিলাম তোমার প্রথম গাড়ি
ঠিক তা নয়...
XR
চাঁদের গর্তে ভ্রমণ করতে দেখুন
এই তো শেষ! পাঠিয়ে দাও! এটাই তোমার কলেজের শেষ আবেদন
অনেক প্রবন্ধ ছিল, তুমি এটা করেছ!
বিশ্বাসই হচ্ছে না, আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে।
অভিনন্দন! আর হ্যাঁ, বাবার দোকানে যেতে ভুলো না। উনি তোমাকে কিছু দেখাতে চায়।

মা বলল, তুমি আমাকে কিছু দেখাতে চাও।
নিশ্চয়ই। চলো আমার সঙ্গে।
কী ভাবছ?
কী ভাবছি? এটা '৭২ মুস্তাং'। সুন্দর। গাড়িটা কার?
প্রায় এক বছর ধরে আমি এটা নিয়ে কাজ করছি।
এখন থেকে এটা তোমার।
কিন্তু আমি এখনো সে রকম কিছু করিনি বা ভালো কোথাও চান্স পাইনি।
তুমি কী করেছ, তা ভেবে তোমাকে গাড়িটা দিচ্ছি না, মিজা। তুমি কেমন মানুষ, সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।
'গাড়িটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে...এবং বাবা আমাকে গাড়ি চালাতে দেখতে পছন্দ করতেন।'
'তিনি খুব গর্বিত ছিলেন। সবকিছু একদম ঠিকঠাকমতো চলছিল...'
(চলবে...)

দুই চালের মাত ৯৭

এখানে দুটি দাবার ধাঁধা দেওয়া আছে। ধাঁধাগুলো দুই চালে মাত করতে হবে। সঠিক সমাধানদাতা তিনজনের জন্য রকমারি ডটকমের সৌজন্যে পুরস্কার হিসেবে রয়েছে ৫০০ টাকার বই। উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ জানুয়ারি। খামের ওপর অবশ্যই 'দুই চালে মাত ৯৭' লিখবেন। উত্তরের সঙ্গে আপনার নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখুন।

ধাঁধা ১

ধাঁধা ২

দুই চালে মাত ৯৬-এর উত্তর

ধাঁধা ১ 1. Rd8+ Kxd8 2. Qc8#
ধাঁধা ২ 1. Re8+ Kf7 2. R1e7#

ধাঁধা ১

ধাঁধা ২

দাবার ধাঁধা ৯৬-এর বিজয়ী

নকিব মুনসিফ, মোহাম্মদপাড়া, গোপালগঞ্জ
শাহরিয়ার রহিম, চকরিয়া, কক্সবাজার
স্বপ্না মণ্ডল, আমতলী, বরগুনা

মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

▪ College Code:1056 ▪ School Code:1098 ▪ EIIN:108572.

ভর্তি-২০২৫ **প্লে/নার্সারি থেকে ৯ম শ্রেণি: বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন**

▪ **শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি:** ২০০৮ সালে ঢাকা বোর্ড কর্তৃক শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত।
▪ এইচএসসি, এসএসসি, জেএসসি এবং পিইসি পরীক্ষার ফলাফল (বাংলা মাধ্যম এবং ইংরেজি ভার্সন):

এইচএসসি	২০২৪ সালে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৩১০৭ জন। পাসের হার ১০০%। জিপিএ-৫ অর্জন করে ২০১১ জন। বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পায় ১৯৬৩ জন। ২০০৯ এবং ২০১৪ সালে ঢাকা বোর্ডে যথাক্রমে ১০ম ও ৭ম স্থান অর্জন করে।
এসএসসি	২০২৪ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১৭৫০ জন। পাসের হার ১০০% এবং জিপিএ-৫ অর্জন করে ১২৯৮ জন। ২০০৯, ২০১৩ এবং ২০১৪ সালে ঢাকা বোর্ডে যথাক্রমে ৫ম, ১০ম ও ৪র্থ স্থান অর্জন করে। তথ্যানুযায়ী, ২০২০ সালে শতভাগ পাসের ভিত্তিতে ঢাকা মহানগরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে মাইলস্টোন কলেজের অবস্থান প্রথম।
জেএসসি	২০১৯ সালে শতভাগ পাসসহ জিপিএ-৫ অর্জন করে ৫৮৯ জন। ২০১৭ সালে শতভাগ পাসসহ জিপিএ-৫ অর্জন করে ৮৪৮ জন। জেএসসিতে ২০১০, ২০১২ এবং ২০১৩ সালে ঢাকা বোর্ডে যথাক্রমে ১৩তম, ৭ম ও ৪র্থ স্থান অর্জন করে।
পিইসি	২০১৯ সালে ১১৮১ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে, শতভাগ পাসসহ জিপিএ-৫ অর্জন করে ১১৩৮ জন। জিপিএ-৫ অর্জনের হার ৯৬.৩৬%। ২০১১ ও ২০১২ সালে ৪র্থ স্থান এবং ২০১৩ ও ২০১৪ সালে সারাদেশে ৩য় স্থান অর্জন করে।

▪ **বিশেষ সুবিধা:** মফস্বল এলাকার ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য আলাদা হোস্টেল এবং পরিবহণের ব্যবস্থা রয়েছে। ছেলে ও মেয়েদের এবং বাংলা মাধ্যম ও ইংরেজি ভার্সনের ক্লাস পৃথক ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এতিম, দরিদ্র কিন্তু মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা ও বৃত্তি প্রদান করা হয়।
▪ কলেজটি এমএনআরএস ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত। উত্তরাস্থ মেইন ক্যাম্পাস ছাড়াও উত্তরার ডিয়াবাড়িতে ২৫ বিঘা জমির উপর অবস্থিত মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের স্থায়ী ক্যাম্পাস। খেলাধুলার জন্য বিশাল মাঠ, সার্বিক নিরাপত্তা সম্বলিত সুবিশাল ক্যাম্পাসটিতে ৮০০ আবাসিক ছাত্রছাত্রীসহ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মেট্রোরেল উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে মাত্র ১০০ গজ দূরে স্কুল ও কলেজটি অবস্থিত।
▪ ঢাকা মহানগরীর বাইরে গাজীপুর ব্যতীত মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের কোন শাখা নেই।
▪ ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিত নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।

কর্নেল নুরুন্ নবী (অব.)
প্রকল্প পরিচালক ও উপদেষ্টা
প্রাক্তন অধ্যক্ষ-ফৌজদারহাট ও ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ এবং
প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ-রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ ও মাইলস্টোন কলেজ

মোহাম্মদ জিয়াউল আলম
অধ্যক্ষ
মাইলস্টোন কলেজ

রিফাত নবী আলম
নির্বাহী অধ্যক্ষ
মাইলস্টোন প্রিপারেটরি কেজি স্কুল

৩০ ও ৪৪ গরিব-ই-নেওয়াজ এভিনিউ, সেক্টর-১১ এবং ডিয়াবাড়ি (মেট্রোরেল উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে মাত্র ১০০ গজ দূরে), তুরাগ, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০। ফোন: ০২-৫৮৯৫৭৭৩৩, ০২-৪৮৯৬৩৪৩৭। মোবাইল: ০১৭৭১৫৮১৬৫০, ০১৯২৯৭৬৬৩৭০, ০১৮১৩৬১০২৭, ০১৯১৬৬৭১৬৪৯, ০১৯১৩৮৪৩১৫৯, ০১৯৪০৩৮৫১৪১, ০১৭২২৭৯৭৬৮, ০১৯৮৪৫৪৮৬৩৩, ০১৯৩৭৬৭৮২৯৭, ০১৯৭১৮১১৭৯৪।

মহাকাশে ভেসে বেড়ানো দুর্দান্ত ব্যাপার

—জোসেফ এম আকাবা
প্রধান নভোচারী, নাসা

Daily ePapers
BD
Click here to join the channel

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সফর করলেন মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থার (নাসা) প্রধান নভোচারী জোসেফ এম আকাবা। এ সফরে তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সামনে বক্তৃতা দেন। এ ছাড়াও বেশ কিছু বিদ্যালয়ে ও প্রতিষ্ঠানে তরুণদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এই নভোচারী। এ ছাড়াও এ সফরে তিনি আর্টেমিস অ্যাকর্ডসে বাংলাদেশের যোগদানের ব্যাপারে আলোচনা করেন। এ নীতিমালা নাসা ও বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান মহাকাশ ও প্রযুক্তি খাতে সহযোগিতা আরও জোরদারে সাহায্য করতে পারে। পাশাপাশি এ সফরে বিজ্ঞানচিন্তাকে দেওয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি নিজের মহাকাশযাত্রা, জীবনযাপনসহ নানা বিষয়ে কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আব্দুল্লাহ আল হোসাইন। ছবি তুলেছেন আশরাফুল আলম।

বিজ্ঞানচিন্তা : নভোচারী হতে কোন বিষয়টা আপনাকে অনুপ্রাণিত করেছে? জীবনের কোন ঘটনা আপনাকে এ পথে নিয়ে এসেছে?

জোসেফ এম আকাবা : আমার নভোচারী হওয়ার যাত্রাটা দীর্ঘ। আমার প্রথম অনুপ্রেরণা জাগে যখন দাদা আমাকে অ্যাপোলো অভিযানের অংশ হিসেবে চাঁদে নভোচারীদের হেঁটে চলার পুরোনো ফিল্ম দেখাতেন।

আমি ভাবতাম, বাহ্, এ তো খুব চমৎকার! বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি বা ধরনের বই পড়তেও খুব পছন্দ করতাম। এ ধরনের পড়াশোনা মহাকাশে যাওয়ার কল্পনা ও চিন্তা জোগাত। কিন্তু জীবন আমাকে ভিন্ন পথে নিয়ে গেল। নভোচারী হওয়ার আগে স্কুলশিক্ষক হিসেবে কাজ করেছি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের গণিত ও বিজ্ঞান পড়াতাম।

সেই সময় নাসা কিছু শিক্ষককে পূর্ণকালীন নভোচারী হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার জন্য খুঁজছিল। তাই নভোচারী হওয়ার পেছনে বলা যায় আমার জীবনে বিশেষ কোনো বাঁক ছিল না, বরং এ এক অভিযাত্রা—বিভিন্ন কাজের অভিজ্ঞতা, আমার শিক্ষা, সব মিলে। তারপরই একজন শিক্ষক থেকে নভোচারী হওয়ার দারুণ সুযোগটা চলে আসে। আমি আসলে অনেক ভাগ্যবান।

বিজ্ঞানচিন্তা : আপনি ২০০৪ সালে নাসার নভোচারী হিসেবে নির্বাচিত হন। এই নিয়োগপ্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কী ছিল? সে জন্য নিজেকে কীভাবে প্রস্তুত করেছেন?

জোসেফ এম আকাবা : নভোচারী হওয়া বেশ কঠিন। কারণ, অনেকেই আবেদন করেন। কিন্তু আমরা নিয়োগ দিই অল্প কয়েকজনকে। কাজেই নভোচারী হওয়ার জন্য আপনার অভিজ্ঞতা নাসার জন্য কতটা সহায়ক, তা তুলে ধরাই সবচেয়ে কঠিন দিক। আমার মতে, সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং অংশ ছিল আমার অভিজ্ঞতা তুলে ধরা, যার মাধ্যমে অন্যান্য আবেদনকারীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারি। প্রক্রিয়াটা দীর্ঘ—স্বাস্থ্য পরীক্ষা, সঙ্গে ছিল বেশ কয়েকটি ইন্টারভিউ।

পুরো প্রক্রিয়াটা খুব চ্যালেঞ্জিং। তারপর আপনি যদি ভাগ্যবান হন, তারা আপনাকে নির্বাচন করবে। আমার বেলায়, আমি স্কুলশিক্ষক থেকে নভোচারী হয়েছি, যার অর্থ হলো, এখন আমি আবার ছাত্র। কারণ, নভোচারী হওয়ার জন্য যা যা শেখা দরকার, সবকিছু শিখতে হবে।

বিজ্ঞানচিন্তা : নাসার মহাকাশ অভিযানের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে আপনাকে কী ধরনের প্রশিক্ষণে অংশ নিতে হয়েছে?

জোসেফ এম আকাবা : নভোচারী হয়ে ওঠার প্রশিক্ষণ খুব কঠিন। নিয়োগের পর প্রথম দিকে আপনাকে 'নভোচারী প্রার্থী' হিসেবে সম্বোধন করা হবে। আর মহাকাশে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এই প্রশিক্ষণ প্রায় দুই বছরের। আপনি মৌলিক কিছু দক্ষতা অর্জন করবেন, স্পেসওয়াক (মহাশূন্যে মহাকাশযান থেকে বাইরে বের হওয়া) কীভাবে করতে হয়, তা শিখবেন। রোবোটিক হাত ওড়ানো শিখতে হবে। উচ্চ কার্যক্ষমতাসম্পন্ন জেট ওড়ানো শিখতে হবে—পাশাপাশি বাড়াতে হবে যোগাযোগ দক্ষতা। এভাবে স্বল্প সময়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা তৈরি হবে। আপনাকে দুই বছর ধরে এই প্রশিক্ষণ নিতে হবে। এরপর মহাকাশ মিশনে নিয়োগ দেওয়া হবে। তারপর আরও ১৮ মাসের প্রশিক্ষণ। অর্থাৎ প্রথম মহাকাশ মিশনের জন্য প্রস্তুত হতে আপনার প্রায় চার বছরের প্রশিক্ষণ লাগবে।

বিজ্ঞানচিন্তা : তিনটি মিশনে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে ৩০৬ দিন থাকাসহ আপনি অনেকগুলো মহাকাশ মিশনে গিয়েছেন। মহাকাশে থাকাকালে আপনার সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত ও অনুভূতিগুলো কী?

জোসেফ এম আকাবা : হ্যাঁ, মহাকাশে যাওয়াটা সত্যিই বিস্ময়কর। আমার তো অনেক স্মরণীয় মুহূর্ত আছে। এর মধ্যে একটি প্রিয় মুহূর্ত ছিল স্পেস শাটলে আমার প্রথম ফ্লাইট। সেদিন আমরা দুজন পৃথিবী ছেড়ে গেলাম। সে জন্য ৮ দশমিক ৫ মিনিট সময় লাগে। স্পেস শাটলটা তখন কাঁপছিল। জানেনই তো, এ জন্য আগে প্রশিক্ষণ নিয়েছি, সিমুলেটরে (প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র) ছিলাম। কিন্তু তখন বাস্তবে প্রথম এর মধ্যে ছিলাম।

সেটা দারুণ এক মুহূর্ত ছিল। ৮ দশমিক ৫ মিনিট পর আমি মহাকাশে পৌঁছালাম। প্রথমবার স্পেস স্টেশন দেখলাম, এত বিশাল! ল্যাবরেটরি, মহাকাশে নির্মিত আমাদের বাড়ি ছিল অবিশ্বাস্য! এটি সম্ভবত মহাকাশে থাকার আমার প্রথম স্মৃতিগুলোর একটি। কিন্তু মহাকাশে ভেসে বেড়ানোটা একটা দুর্দান্ত ব্যাপার!

জানালার বাইরে তাকিয়ে আমাদের সুন্দর গ্রহটা দেখা—এসব স্মৃতি আমি কখনো ভুলব না; বিশেষ করে দুপুরে খাবারের সময়। দারুণ রোমাঞ্চকর একটা ব্যাপার। এটাই সম্ভবত আমাদের মিশনের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অংশ ছিল। আমি নিশ্চিত, আমার হৃদ্‌যন্ত্রের কম্পন খানিকটা বেড়ে গিয়েছিল।

বিজ্ঞানচিন্তা : ভয় কাজ করেনি?

জোসেফ এম আকাবা : মনে হয় না। আমরা অবশ্য বেশ উত্তেজিত ছিলাম; বিশেষ করে (নভোযান) উৎক্ষেপণের সময়। সময়টা ছিল উত্তেজনা পূর্ণ। সম্ভবত এটি ছিল আমাদের মিশনের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অংশ। আমি নিশ্চিত, আমার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু ওটা আসলে ভয় নয়, উত্তেজনা। ধরুন, আপনার সব ধরনের প্রশিক্ষণ রয়েছে। আপনি মিশন পরিচালনার জন্য প্রস্তুত। স্বীকার করছি, প্রথম স্পেসওয়াকের জন্য বাইরে দরজার বাইরে গিয়েছি, তাঁরা দরজা খুলে দিলেন। এখন মহাকাশ স্টেশন থেকে মহাকাশে যাচ্ছি। প্রথম মিনিটে কিছুটা ভয় কাজ করছিল। তারপর আপনার প্রশিক্ষণের প্রয়োগ শুরু। যা শিখেছি, গিয়ে সে কাজ করা। তাই ভয়ের চেয়ে উত্তেজনাই ছিল বেশি।

বিজ্ঞানচিন্তা : স্পেসওয়াক সম্পর্কে বলছিলেন। স্পেসওয়াকের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং দিক ও আপনার অভিজ্ঞতার কথা বলুন।

জোসেফ এম আকাবা : আমাদের করা সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং কাজগুলোর একটি সম্ভবত স্পেসওয়াক। যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের হিউস্টনে আমাদের বড় একটি সুইমিংপুল আছে। সেটায় মহাকাশ স্টেশনের একটি মডেল রয়েছে। আমরা যে হ্যান্ডরেইল (সিঁড়ির হাতল) ধরি, একই ধরনের সবই এতে রয়েছে। যে সরঞ্জাম নিয়ে কাজ করব, তার সব রয়েছে। আসলে স্পেসওয়াকের আগে সেগুলো ব্যবহার করে বারবার প্রশিক্ষণ নিয়েছি।

এসব প্রশিক্ষণ খুব সহায়ক, কিন্তু কঠিন। প্রশিক্ষণের সময় আমরা সকাল নয়টায় পানির নিচে যেতাম, আর বেলা ৩টায় পানির ওপর উঠে আসতাম। এভাবে প্রায় ছয় ঘণ্টা পানির নিচে থাকতাম, কোনো খাবার ছাড়াই। সামান্য পানি (খাওয়ার পানি) ছিল। এরপর বাস্তবে যখন স্পেসওয়াক করবেন, তখন আপনি জানেন যে সবচেয়ে কঠিন বিষয় হলো সেই ছয় বা সাত ঘণ্টা ধরে প্রতিটি কাজে আপনার মনোযোগ দেওয়া। স্পেসওয়াকের সময় আসলে সেটাই করতে হয়।

আর এতে অনেক প্রস্তুতির দরকার। যখন কোনো কাজ পরিচালনা করতে হয়, তখন সে প্রস্তুতিই আপনাকে সফল করে তোলে।

বিজ্ঞানচিন্তা : মহাকাশ স্টেশনে থাকার সময় আপনি কোন ধরনের পরীক্ষা বা গবেষণায় যুক্ত ছিলেন?

জোসেফ এম আকাবা : আমাদের মহাকাশ ও মহাকাশ স্টেশনে যাওয়ার মূল কারণ বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম পরিচালনা করা।

সেই বিজ্ঞানের একটি অংশ হচ্ছে পৃথিবীতে জীবনকে উন্নত করবে, এমন কাজ করা। তাই নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে পৃথিবীতে কাজ করা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মহাকাশ স্টেশনে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাই, যাতে পৃথিবীতে আমরা সেগুলো ব্যবহার করতে পারি। আমরা কীভাবে আরও অনুসন্ধান করতে পারি, সেটি কাজের আরেকটি বিষয়। যেমন আমরা কীভাবে চাঁদে-মঙ্গল গ্রহে যাওয়া শিখতে পারি, তা নিয়ে গবেষণা হয়।

আমার সবচেয়ে স্মরণীয় গবেষণাগুলোর একটি মহাকাশে উদ্ভিদ জন্মানো। সেটা মজার ছিল। একটি বীজ নিলাম, তারপর পানি দিলাম, আর উদ্ভিদের বেড়ে ওঠা নথিভুক্ত করলাম। আমরা আসলেই তিন জাতের লেটুসগাছ জন্মাতে পেরেছি। সেগুলো চাষাবাদ করতে পেরেছি। তারপর সেগুলো খেয়েছি।

কিন্তু যখন আমরা চাঁদে যেতে চাই, মঙ্গল গ্রহে যেতে চাই, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা নিজেদের খাদ্য নিজেরাই উৎপাদন করা শিখতে পারব। কাজেই পরীক্ষা-নিরীক্ষাটি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমরা আরও অনেক গবেষণাই মহাকাশে করছি—মানবদেহ সম্পর্কে শেখা, কোষ নিয়ে কাজ করে নতুন ওষুধ তৈরি করা, যা আমরা পৃথিবীতে ব্যবহার করতে পারি।

কাজেই চমৎকার অনেক বৈজ্ঞানিক কাজ করেছি, যা নভোচারী হিসেবে আমাদের প্রাথমিক কাজ। আমরা পৃথিবীতে থাকা বিজ্ঞানীদের কান, চোখ ও হাত হিসেবে কাজ করি।

বিজ্ঞানচিন্তা : আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে বসে গবেষণা করার বিষয়টি আপনার কেমন লাগে?

জোসেফ এম আকাবা : মহাকাশ স্টেশনে বৈজ্ঞানিক কাজ পরিচালনা করা দারুণ ব্যাপার। আপনি জানেন, প্রযুক্তি ও ওষুধ খাতে যারা সত্যিকার অগ্রগতি নিয়ে আসছে, এমন এক বিশাল দলের ছোট্ট একটি অংশ আপনি। একজন সাবেক স্কুলশিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন সময় যোগাযোগ করেছি আমি। তাই মহাকাশে অবস্থান করা ও সেখানে যা হচ্ছে, তার অংশীদার হওয়াটা আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানের। আমরা জানি যে মহাকাশে যা শিখছি, তা পৃথিবীর প্রত্যেকের উপকার করতে যাচ্ছে। এ ভাবনাটিই আমাদের আরও অনুসন্ধানের অনুপ্রেরণা দেয়।

বিজ্ঞানচিন্তা : প্রথমবার ওজনহীনতা অনুভব করার অনুভূতি কেমন ছিল? আর মাইক্রোগ্র্যাভিটিতে জীবনযাপন ও কাজ করার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার অনুভূতিই-বা কেমন?

জোসেফ এম আকাবা : মহাকাশে যাওয়ার সবচেয়ে অবিশ্বাস্য বিষয়গুলোর একটি এটি। আপনি পৃথিবী থেকে যাত্রা করলেন, রকেটের মাধ্যমে পৃথিবী পেরিয়ে গেলেন। সে জন্য মাত্র ৮ দশমিক ৫ মিনিট সময় লেগেছিল আমাদের। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের অধীনতা ছাড়িয়ে আপনি এখন মহাকাশে। পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছেন। ওজনহীনতা অনুভব করছেন। এটাকে আমরা মহাকাশ শাটলে 'মাইক্রোগ্র্যাভিটি পরিবেশ' বলি।

স্পেস শাটলটি বেশ ছোট। তাই সেখানে থাকা কালে আপনার সিটবেল্ট বাঁধা। প্রথমবার যখন সিটবেল্ট খুলবেন, ভাসতে শুরু করবেন। দুর্দান্ত একটি বিষয়। তারপর মহাকাশ স্টেশনে প্রবেশের পর দেখবেন, এটা এক বিশাল গবেষণাগার। তখন আপনি স্টেশনের মডিউলজুড়ে ভাসতে পারবেন।

> মহাকাশে গিয়ে আপনি মেঝে থেকে লাফ দিতে পারবেন। দেয়ালে ঝুলতে পারবেন। ছাদের দিকে লাফ দিতে পারবেন

নিজেকে সুপারহিরো মনে হবে আপনার। কারণ, তখন আপনি উড়তে পারছেন। একবার আমি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলছিলাম। তাঁদের জিজ্ঞাসা করলাম, স্পাইডারম্যান পছন্দ করেন কি না। তাঁরা সবাই বললেন, হ্যাঁ, আমরা স্পাইডারম্যান পছন্দ করি। মহাকাশে গিয়ে আপনি মেঝে থেকে লাফ দিতে পারবেন। দেয়ালে ঝুলতে পারবেন। ছাদের দিকে লাফ দিতে পারবেন। আপনি নিজেই যেন সেখানে স্পাইডারম্যান!

এ সবই অবশ্য সেখানে খুব স্বাভাবিক মনে হয়। মানিয়ে নিতে শরীর প্রায় এক দিন সময় নেবে। এটাই পৃথিবীতে থাকার সঙ্গে এখানে (মহাকাশ স্টেশন) থাকার পার্থক্য। দু-এক দিনের মধ্যে মনে হবে, আমরা মহাকাশে থাকার জন্যই জন্মেছি। আপনি শিখে যাবেন, কীভাবে শরীর নড়াচড়া করতে হয়, কীভাবে ভেসে বেড়াতে হয়। সেখানে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করাটা চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু খাপ খাইয়ে নেওয়ার বিষয়টি খুব দ্রুত করতে হয়। শরীরকে মানিয়ে নিতে হয়। আমরা মানুষেরা মহাকাশে বসবাস করা ও সেখানকার কাজগুলো সত্যিই ভালোভাবে করতে পারি।

বিজ্ঞানচিন্তা : নাসা ও অন্য মহাকাশ গবেষণা সংস্থাগুলো মঙ্গল গ্রহ অনুসন্ধানের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। আমরা দীর্ঘ দূরত্বের মহাকাশ ভ্রমণের চ্যালেঞ্জগুলো কীভাবে জয় করব বলে আপনি মনে করেন?

জোসেফ এম আকাবা : হ্যাঁ, দীর্ঘস্থায়ী মহাকাশ ভ্রমণ করতে গেলে আমরা অবশ্যই কিছু চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ব। আর্টেমিস প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে আমরা চাঁদে ফিরে যাওয়ার জন্য কাজ করছি, যাতে একপর্যায়ে মঙ্গল গ্রহে পৌঁছাতে পারি।

মঙ্গল গ্রহে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। যাঁরা সেখানে কাজ করতে যাবেন, তাঁদের জীবন বাঁচানোর উপায়গুলো নিশ্চিত করতে হবে। মঙ্গল গ্রহের যাত্রা প্রায় ছয় মাসের হতে যাচ্ছে। যেমনটা বলেছিলাম, যখন আমরা মহাকাশ স্টেশনে যাই, আট মিনিটে মহাকাশে পৌঁছে যাই। আর এক দিনের মধ্যে মহাকাশ স্টেশনে থাকি।

চাঁদে যেতে চাইলে তিন দিন সময় লাগে। কিন্তু মঙ্গলে যখন যাবেন, সেটা অনেক দূরে। বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি হবে বিকিরণ, আর কীভাবে আমরা শরীরকে রক্ষা করতে পারি, সেটা। আমার মতে, এখানে আমাদের আরও কিছু কাজ বাকি আছে। আর এসব কাজ বেশ কঠিন।

কিন্তু আমরা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে একত্রে কাজ করছি। আমরা বিভিন্ন ধারণা এক করছি। আমি মনে করি, মানবজাতি হিসেবে চ্যালেঞ্জগুলো আমরা একসঙ্গে অতিক্রম করতে পারব। কাজটা খুব কঠিন হবে। কিন্তু আমি জানি, আমরা সেখানে পৌঁছাব।

বিজ্ঞানচিন্তা : মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে ফেরার পর আপনার মধ্যে কোনো পরিবর্তন লক্ষ করেছেন?

জোসেফ এম আকাবা : হ্যাঁ, পৃথিবীতে ফেরাটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। মহাকাশে থাকার সময় প্রতিদিন প্রায় দুই ঘণ্টা ব্যায়াম করি আমরা। সেখানে এমন একটা ব্যায়ামের যন্ত্র রয়েছে, যা ওজন তোলার মতো অনুভূতি দেয়। প্রতিদিন ঘণ্টাখানেক এটা অনুশীলন করতাম। এটা মহাকাশে ভাসমান অবস্থায় আমাদের পেশিগুলো শক্তিশালী রাখতে সহায়তা করে।

আমাদের একটি ট্রেডমিলও রয়েছে, মহাকাশে (মহাকাশ স্টেশন) দৌড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এতে বাঞ্জি কর্ড রয়েছে, যা আমাদের ট্রেডমিলের সঙ্গে ধরে রাখে, যাতে আমরা দৌড়াতে পারি। এ ছাড়া আমাদের একটি স্টেশনারি সাইকেল রয়েছে, যা হৃৎপিণ্ড ও রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থার জন্য উপকারী এবং হাড়ের ঘনত্ব বজায় রাখতে সহায়তা করে। মহাকাশ থেকে ফিরে যদি ব্যায়াম না করেন, তা আপনার পেশিশক্তি ও হাড়ের ঘনত্বের ওপর প্রভাব ফেলবে।

আপনি যখন পৃথিবীতে ফিরলেন, তখন ছয় মাস পর প্রথমবারের মতো মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অনুভব করবেন। মাথাটা খুব ভারী মনে হবে। হাত তোলা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আপনার মনে হবে, মানুষ পৃথিবীতে কীভাবে বাস করে? কাজেই একটি অভিযোজনকাল (মানিয়ে নেওয়ার সময়কাল) থাকে। তাই প্রথম কয়েকটা দিন কিছুটা কঠিন।

আমরা পৃথিবীতে ফিরে প্রথম ৪৫ দিন ব্যায়াম ও মানিয়ে নেওয়ার কাজ করি। এটা পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করে।

বিজ্ঞানচিন্তা : ক্যারিয়ারের পেছনে ফিরে যাঁরা মহাকাশচারী হতে বা মহাকাশ অনুসন্ধানে ক্যারিয়ার গড়তে চান, তাঁদের জন্য কী পরামর্শ দেবেন?

জোসেফ এম আকাবা : আমার সবচেয়ে বড় পরামর্শ হলো, এমন পেশা খুঁজে বের করুন, যা আপনি সত্যিই ভালোবাসেন, যার প্রতি আপনার গভীর আগ্রহ রয়েছে। এরপর কঠোর পরিশ্রম করুন।

আপনি আপনার পেশাকে ভালোবাসেন, গভীর উৎসাহী হোন। এটা তখন আর কাজের মতো মনে হবে না। মনে হবে, আপনার যা ভালো লাগে, সেটাই করছেন। এমন লোকদের আমি বলব, নভোচারীর পেশা বেছে নিন। আমার পড়াশোনা ভূতত্ত্ব নিয়ে। আমাদের মধ্যে রয়েছেন ভূতত্ত্ববিদ, চিকিৎসক, পদার্থবিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, পাইলটসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ।

মহাকাশ অনুসন্ধানে আমাদের একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ দল প্রয়োজন। তাই কোনো পেশাই অন্যটির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। আপনি যা করতে পছন্দ করেন, সেটাই মন দিয়ে করুন। কঠোর পরিশ্রম করুন। আর এ যাত্রাপথটা উপভোগ করুন, মজা করুন। প্রচুর সুযোগ রয়েছে। যদি সেটা জানেন, আপনিও মহাকাশে যেতে পারবেন।

আমরা সবাই প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী—আমরা সবাই একসঙ্গে অনুসন্ধানে নামি।

বিজ্ঞানচিন্তা : যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের বাইরে কি কারও নভোচারী হওয়ার সুযোগ আছে? থাকলে কোনো বাংলাদেশির ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটা কী?

জোসেফ এম আকাবা : অন্য দেশের নাগরিকদের নাসায় কাজ করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। তবে নাসার মহাকাশচারী হতে আপনাকে অবশ্যই মার্কিন নাগরিক হতে হবে। কিন্তু নাসায় আরও অনেক চাকরি আছে, যেখানে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের নাগরিকদের নিয়োগ দিই। তাই কাজের অনেক সুযোগ আছে। তবে বেসরকারি মহাকাশচারীদের জন্য আরও বেশি সুযোগ তৈরি হচ্ছে। অন্যান্য দেশও তাদের নাগরিকদের মহাকাশে পাঠানোর জন্য কাজ করছে।

একনজরে

পুরো নাম : জোসেফ মিখায়েল আকাবা
জন্ম তারিখ : ১৭ মে ১৯৬৭
বাবা : র‍্যালফ আকাবা
মা : এলসি আকাবা
মহাকাশে মোট দিনযাপন : ৩০৬ দিন (মোট ৩ মিশন)

আমি বিশ্বাস করি, আরও সুযোগ তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশে যদি কোনো শিক্ষার্থী নভোচারী হতে আগ্রহী হন, তাঁদের জন্য এটা একটা রোমাঞ্চকর সময়। আবারও বলছি, এমন কিছু করুন, যেটা আপনি ভালোবাসেন। আপনি হয়তো জানেন না, কখন সে সুযোগ তৈরি হয়ে যাবে।

বিজ্ঞানচিন্তা : তাহলে বাংলাদেশিদের জন্য নাসায় নভোচারী হওয়া বাদে আর কী সুযোগ রয়েছে, যদি ব্যাখ্যা করে বলতেন।

জোসেফ এম আকাবা : আমি কিছু সহকর্মীর সঙ্গে কাজ করেছি, যাঁরা নাসা চ্যালেঞ্জেস প্রোগ্রামের বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কাজ করেছেন। তাঁরা সারা বিশ্বের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অংশ নিয়েছেন। খুব ভালো করছেন। পুরস্কার জিতে নিয়েছেন, নিচ্ছেন। কিন্তু যখন আপনি নাসার সব কাজ দেখবেন, সেখানে অনেক সুযোগ রয়েছে।

আশা করি, নাসা ও অন্যদের সঙ্গে একটি অংশীদার হতে পারে আপনার দেশ। সামগ্রিকভাবে আর্টেমিস প্রোগ্রামের অংশ হতে পারে। সবার সঙ্গে আমি আশা করছি, আপনার দেশের শিক্ষার্থীদের আরও সুযোগ তৈরি হবে।

ডার্ক এনার্জি কি সত্যিই আছে

দীপেন ভট্টাচার্য

আমার এখনো মনে পড়ে, ১৯৯৮ সালে যখন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি গবেষক দল পৃথিবী থেকে দেখা বেশ কয়েকটি সুপারনোভা টাইপ 1A-এর আপাত-উজ্জ্বলতার মান বিশ্লেষণ করে দেখাল, মহাবিশ্বের প্রসারণ তো শ্লথ হচ্ছেই না, বরং ত্বরান্বিত হচ্ছে, তখন কী রকম উচ্ছ্বসিত হয়েছিলাম। এ ত্বরণের মূল কারণ হিসেবে দেখানো হয় আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের একটি রাশিকে, যাকে ল্যামডা বা মহাজাগতিক ধ্রুবক বলা হয়, সেটির বিকর্ষণ চাপকে (চিত্র ১)। ল্যামডাকে আমরা ডার্ক এনার্জি বা গুপ্তশক্তি বলি। অন্যতম বিজ্ঞান পত্রিকা *সায়েন্স* ম্যাগাজিন এ গবেষণাকে ওই বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। ২০১১ সালের পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কারও ওই দুই দলের তিনজনকে দেওয়া হয়। বর্তমানে জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যার পাঠ্যপুস্তকে ল্যামডার কারণে মহাজাগতিক ত্বরণ হচ্ছে, এটি মোটামুটি একটি প্রতিষ্ঠিত অধ্যায়।

সুপারনোভার উজ্জ্বল্যের ওপর ভিত্তি করে মহাবিশ্বের ত্বরণের যে মডেল আমরা পাই, তাতে দেখা গেল, মহাবিশ্বের ৭০ শতাংশ উপাদান হলো অদৃশ্য ডার্ক এনার্জি, ২৫ শতাংশ হলো ডার্ক ম্যাটার বা গুপ্তবস্তু (তমোবস্তুও বলা হয়), যাকে এখনো আমরা সরাসরি অবলোকন করতে পারিনি। আর মাত্র ৫ শতাংশ হলো সাধারণ বস্তু, যা আমরা চোখে বা ডিটেকটর দিয়ে দেখতে পাই। এই মডেলের নাম হলো ল্যামডা-সিডিএম, যেখানে ল্যামডা হলো ডার্ক এনার্জি এবং সিডিএম হলো কোল্ড (শীতল) ডার্ক ম্যাটার। মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বা সিএমবির পর্যবেক্ষণকেও এই ল্যামডা-সিডিএম মডেল দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়।

এখানে মনে হয় আইনস্টাইনের ক্ষেত্র সমীকরণটির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না (চিত্র ১)। এই সমীকরণের ডান দিকের স্ট্রেস-এনার্জি টেনসরটি হলো শক্তি ও বস্তুর ভর, যা কিনা স্থানকালের বক্রতার জন্য দায়ী। সমীকরণের বাঁ দিকের রাশিগুলো—রিচি টেনসর, রিচি স্কেলার ও মেট্রিক টেনসর এই বক্রতার পরিমাণ নির্দেশ করে। আইনস্টাইন তাঁর সমীকরণটি প্রণয়ন করে দেখলেন, সেটি একটি অস্থিতিশীল মহাবিশ্বের ভাবীকথন করছে। কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল, মহাবিশ্বের খ-গোল বস্তুরা মোটামুটি স্থিত। তাই মহাবিশ্বকে স্থিতিশীল করতে গিয়ে তিনি সমীকরণে একটি ধ্রুবক বসালেন, সেটা হলো ল্যামডা, যাকে আমরা মহাজাগতিক ধ্রুবক বলেও জানি। পরবর্তীকালে যখন প্রমাণিত হলো মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে, তখন আইনস্টাইন বলেছিলেন, এটা তাঁর জীবনের এক মস্ত ভুল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, ল্যামডার একটা আলাদা জীবন আছে এবং ১৯৯৮ সালের পর থেকে সেটির স্থান মহাজাগতিক বিজ্ঞানে একেবারে পাকাপোক্ত হয়ে গেল।

কিন্তু ল্যামডাটা আসলে কী? আইনস্টাইনের মডেলে সেটি নিতান্তই একটি জ্যামিতিক রাশি, যা কিনা একটি ঋণাত্মক চাপ দিয়ে স্থানকালকে প্রসারিত করে। এই প্রসারণ কিন্তু ল্যামডার স্থানীয় ঘনত্ব কমিয়ে দেয় না; বরং সেটির পরিবর্তন হয় না, সে জন্য ল্যামডার শক্তির ঘনত্ব ধ্রুব। অন্যদিকে সামগ্রিকভাবে মহাবিশ্বের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ল্যামডার শক্তির পরিমাণ বাড়তেই থাকে এবং আপাতদৃষ্টে এটা মনে হতে পারে যে এখানে শক্তির সংরক্ষণ তত্ত্ব লঙ্ঘিত হচ্ছে। আসলে সাধারণ আপেক্ষিকতায় শক্তির সংরক্ষণ ধ্রুপদি পদার্থবিদ্যা থেকে ভিন্নভাবে কাজ করে। এই তত্ত্বে স্থানীয়ভাবে শক্তি সংরক্ষিত হলেও মহাবিশ্বের পর্যায়ে সেটি হয় না, কারণ সেখানে স্থানকাল গতিশীল বা ডায়নামিক।

আমরা ধারণা করছি, ল্যামডা কোনো মৌলিক বল বা মিথস্ক্রিয়ার সাহায্যে স্থানকালকে প্রসারিত করছে না, বরং এটি স্থানকালে প্রোথিত—এর প্রভাব নিতান্তই জ্যামিতিক।

সাধারণ আপেক্ষিকতায় এটা নতুন কোনো কথা নয়, কারণ ক্ষেত্র সমীকরণের ডান দিকে যে স্ট্রেস-এনার্জি টেনসর আছে, সেটি বাঁ দিকের বক্রতার সঙ্গে জ্যামিতিকভাবেই যুক্ত।

আমরা পর্যবেক্ষণ থেকে ল্যামডার শক্তির ঘনত্ব বের করতে পারি। এর পরিমাণ হলো প্রতি ঘনমিটারে প্রায় ৫×১০^{-৩৩} জুল। এ মানকে আমাদের দৈনন্দিন পরিচিত কিছু ঘনত্বের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। পৃথিবীপৃষ্ঠে সূর্যের আলোর শক্তি-ঘনত্ব মোটামুটি প্রতি ঘনমিটারে ৫×১০^{৯} জুল, অর্থাৎ মাত্র ১০ হাজার গুণ বেশি। তাহলে কি এটা বলা যায় না যে সূর্যের উত্তাপ যেমন আমরা সহজেই বুঝতে পারি, সে রকমভাবে ঘরে বসেই, আকাশ পর্যবেক্ষণ না করেই ল্যামডার শক্তির মানটি আমরা নির্ধারণ করতে পারি। এর উত্তর হচ্ছে 'না', কারণ ল্যামডা যদি থেকেও থাকে, সেটি স্থানকালের চাদরের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে মহাজাগতিক পর্যবেক্ষণ ছাড়া সেটির মানকে আলাদা করে পরিমাপ করার কোনো পদ্ধতি আমাদের হাতে নেই।

ল্যামডার শক্তি নিয়ে আরেকটি ধাঁধা বিজ্ঞানীদের খুব ভাবায়। ল্যামডাকে আমরা বলছি শূন্যস্থানের (ভ্যাকুয়াম) শক্তি। কিন্তু আমরা জানি শূন্যস্থান শূন্য নয়, সেখানে ক্রমাগত কোয়ান্টাম ক্ষেত্রের ওঠানামা হচ্ছে, অলীক কণা সৃষ্টি হচ্ছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। এই যে ক্ষেত্র (বা কণা), সেটি কোয়ান্টাম, অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন নয়, বরং পৃথক কোয়ান্টার সমষ্টি। এ সমষ্টির শক্তির পরিমাণকে যদি আমরা গণনা করি, তবে যে সংখ্যাটা আমরা পাই, সেটা প্রতি ঘনমিটারে $১০^{১১৩}$ জুল। খুব বড় একটি সংখ্যা। এ হিসাব আমরা পাই, যদি অলীক কোয়ান্টার ইন্টিগ্রেশনের ওপরের সীমাটি প্ল্যাঙ্ক স্কেল ($১০^{১৯}$ গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট) পর্যন্ত ধরি। কিন্তু যদি আমরা ইন্টিগ্রেশনের ওপরের সীমা একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের (GUT) স্কেল ধরি (অর্থাৎ $১০^{১৬}$ গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট), তাহলে শক্তির ঘনত্ব হবে প্রতি ঘনমিটারে $১০^{১১০}$ জুল। এটি একটি অভাবনীয় সংখ্যা, যা পর্যবেক্ষিত ল্যামডার শক্তির তুলনায় $১০^{১১০}$ গুণ (অথবা ওপরের সীমা প্ল্যাঙ্ক স্কেল ধরলে $১০^{১২০}$ গুণ বেশি)।

ভ্যাকুয়াম শক্তি এত বিশাল হলে আমরা কি সেটা দেখতে পেতাম না? এটা হতে পারে যে যেহেতু সেটি সমসত্ত্বভাবে সবখানে বিরাজমান, সেহেতু এটাকে আমরা একটা ভূমিরেখা হিসেবে ভেবে নিতে পারি। অর্থাৎ এই বিশাল শক্তি ঘনত্ব

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$$

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$$

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu} - \Lambda g_{\mu\nu}$$

$G_{\mu\nu}$ = আইনস্টাইন টেনসর $\quad R_{\mu\nu}$ = রিচি টেনসর

R = রিচি স্কেলার $\quad g_{\mu\nu}$ = মেট্রিক টেনসর

$T_{\mu\nu}$ = স্ট্রেস-এনার্জি টেনসর $\quad \Lambda$ = ল্যামডা (মহাজাগতিক ধ্রুবক)

G = মহাকর্ষীয় ধ্রুবক $\quad C$ = আলোর বেগ

চিত্র ১ : আইনস্টাইনের ক্ষেত্র সমীকরণ। এই সমীকরণের ডান দিকের স্ট্রেস-এনার্জি টেনসরটি হলো শক্তি ও বস্তুর ভর, যা কিনা বাঁ দিকের স্থানকালের বক্রতার জন্য দায়ী।

হলো সমুদ্রপৃষ্ঠের তল, আর আমরা শুধু ঢেউয়ের উচ্চতা নির্ধারণ করতে পারি, যেমন পৃথিবীপৃষ্ঠে সৌর আলোর শক্তি-ঘনত্ব। এ অনুকল্প আমাদের উদ্ধার করতে পারত, কিন্তু এখানে বাদ সাধবে আইনস্টাইনের ক্ষেত্রতত্ত্ব, কারণ সেখানে ল্যামডা ঋণাত্মক চাপ সৃষ্টি করছে। অর্থাৎ আমরা কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ত্বের গণনায় যে বিশাল মানটি পাচ্ছি, তা মহাবিশ্বকে এত দ্রুত প্রসারিত করবে যে নক্ষত্র বা গ্যালাক্সি আর গঠিতই হবে না, মহাবিশ্বের সব কণা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়বে। অন্যদিকে এই শক্তিকে যদি আমরা ক্ষেত্র সমীকরণের স্ট্রেস-এনার্জি টেনসরের অন্তর্ভুক্ত করি, তবে সেটি সমীকরণের বাঁ দিকের স্থানকালকে এমনভাবে বাঁকিয়ে দেবে যে মহাবিশ্ব প্রসারিত তো হবেই না; বরং একটি বিন্দুতে আপতিত হবে।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মহাবিশ্ব ওপরের দুটি পরিণতির কোনোটিই অনুসরণ করেনি, বরং মোটামুটি একটি সাম্যাবস্থা বজায় রেখে প্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ ল্যামডার মান সাংঘাতিক বড়ও নয়, আবার ছোটও নয়। এ সমস্যাকে 'সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যতা সমস্যা' (ফাইন টিউনিং প্রবলেম) বলা হয়। অর্থাৎ কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ত্ব থেকে পাওয়া শূন্যতার বিশাল শক্তি-ঘনত্ব কীভাবে কমে ল্যামডার অল্প শক্তি-ঘনত্ব বা চাপে পরিণত হয়েছে, যে ঋণাত্মক চাপ গ্রহ-নক্ষত্র-গ্যালাক্সি তৈরিতে বাধা দেয় না। এ সমস্যা সমাধানে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীদের কিছু প্রস্তাবনা আছে। কিন্তু সেই আলোচনা আমাদের আজকের মূল বিষয়ে আলোকপাত করতে সাহায্য করবে না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, যদিও ল্যামডা-সিডিএম মডেলটি পর্যবেক্ষণমূলক ডেটা মেলানোর ক্ষেত্রে বেশ সফল, এটি কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেয় না। তাদের মধ্যে একটি হলো সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যতা সমস্যা, যা নিয়ে ওপরে আলোচনা করলাম। এ ছাড়া পরোক্ষভাবে হাবল ধ্রুবকের মান নিয়ে একটা সমস্যা আছে, যাকে 'হাবল টেনশন' বা 'হাবল দ্বন্দ্ব' বলা হয়; সেটা নিয়ে আমরা এ প্রবন্ধের একদম শেষে কথা বলব। এখন প্রশ্ন হলো, এসব সমস্যার সমাধানে ল্যামডাকে বাদ দিয়ে আমরা বিকল্প কোনো মডেলের কথা ভাবতে পারি কি না। এ রকমই একটি মডেল নিউজিল্যান্ডের ক্যান্টারবেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভিড উইল্টশায়ারের নেতৃত্বে একটি গবেষক দল উত্থাপন করেছেন। তাঁরা এটির নাম দিয়েছেন 'টাইমস্কেপ মডেল'।

টাইমস্কেপ মডেলের মূল বক্তব্য হলো ডার্ক এনার্জির কারণে মহাবিশ্বের আপাত-ত্বরণ একটি পর্যবেক্ষণ-বিভ্রম এবং এই ত্বরণকে মহাবিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সম্প্রসারণের গড় গতিবেগ দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। মডেলটি আমাদের চিরাচরিত কোপার্নিকাসের নীতি—অর্থাৎ বড় স্কেলে মহাবিশ্ব দেখতে একই রকম বা এটির বস্তুর বিন্যাস রৈখিক এবং কৌণিকভাবে সমসত্ত্ব—এ ধারণা থেকে বেরিয়ে আসার সুপারিশ করছে। এটি বলছে, মহাবিশ্ব সমসত্ত্ব নয়, বরং বড় স্কেলে বিশাল 'শূন্যস্থান' (যেখানে বলতে গেলে কোনো গ্যালাক্সিই নেই) এবং 'প্রাচীরে' (গ্যালাক্সি ও গ্যালাক্সি দলের অঞ্চল বা সুপারক্লাস্টার) বিভক্ত।

এ মডেল অনুসারে, শূন্যস্থানগুলো দেয়াল বা প্রাচীরের চেয়ে দ্রুত প্রসারিত হয়, কারণ তাদের মধ্যে কোনো গ্যালাক্সি না থাকায় সেখানে মহাকর্ষীয় টান কম থাকে। আবার যেহেতু বর্তমানে এই ফাঁকা জায়গাগুলো মহাবিশ্বের আয়তনের বেশির ভাগ অংশ দখল করে আছে, তাই সামগ্রিক সম্প্রসারণের হারে তাদের অবদান বেশি। সেখানে আবার প্রাচীরগুলোর তুলনায়, সাধারণ আপেক্ষিকতা অনুযায়ী সময় আস্তে চলে। গুপ্তশক্তি মহাবিশ্বকে ত্বরান্বিত করছে বলে অনুমান করার পরিবর্তে টাইমস্কেপ মডেলটি শূন্যস্থান ও প্রাচীরগুলোর প্রসারণের পার্থক্যজনিত সময় ও গতিকে আপাত-ত্বরণের পর্যবেক্ষণের

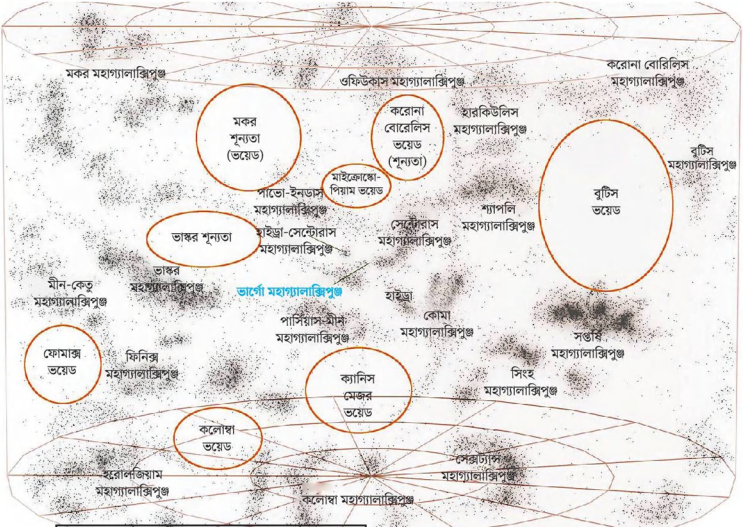

চিত্র ২ : সুপারক্লাস্টার বা মহাগ্যালাক্সিপুঞ্জ (গ্যালাক্সি দল) এবং বিশাল শূন্যস্থান নিয়ে আমাদের স্থানীয় মহাবিশ্ব গঠিত

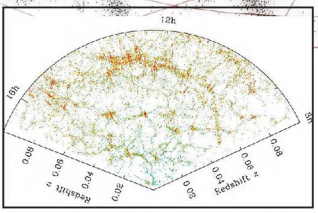

চিত্র ৩ : স্লোন ডিজিটাল স্কাই সার্ভেকৃত আমাদের স্থানীয় মহাবিশ্বের মানচিত্রে দেয়াল এবং শূন্যতাগুলো স্পষ্ট। এখানে প্রতিটি বিন্দু একটি গ্যালাক্সি এবং সর্বোচ্চ দূরত্ব ১.৪ বিলিয়ন আলোকবর্ষ

জন্য দায়ী করছে।

মডেলটি যে একেবারে নতুন, এমন নয়। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির সুবীর সরকার ২০০৭ সালেই বলেছিলেন, বড় স্কেলেও মহাবিশ্ব সমসত্ত্ব হবে—এ রকম মনে করার কোনো কারণ নেই এবং সুপারনোভার ঔজ্জ্বল্য আমাদের আশপাশের শূন্যস্থান দিয়ে হয়তো ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

টাইমস্কেপ মডেল যদি সত্যিই দেখাতে পারে যে মহাবিশ্বের ত্বরণ একটি স্থানীয় বিভ্রম এবং ডার্ক এনার্জির অস্তিত্ব নেই, তাহলে সেটি 'হাবল টেনশন' বা 'হাবল দ্বন্দ্ব' সমাধান করলেও করতে পারে। হাবলের ধ্রুবক, H_0, মহাবিশ্ব কত দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে, সেটার পরিমাপক। একটি গ্যালাক্সি যদি আমাদের থেকে ১ মেগাপারসেক (১ মিলিয়ন পারসেক বা ৩.২৬ মিলিয়ন আলোকবর্ষ) দূরে থাকে, তবে সে আমাদের থেকে প্রতি সেকেন্ডে H_0 কিলোমিটার বেগে সরে যাচ্ছে। এই ধ্রুবক মাপার দুটি প্রধান পদ্ধতি আছে—একটি হলো স্থানীয়ভাবে সেফিড বিষম তারা ও টাইপ 1A সুপারনোভার পর্যবেক্ষণ, আরেকটি হলো প্রারম্ভিক মহাবিশ্বের সিএমবি বিকিরণের বিশ্লেষণ। প্রথম পদ্ধতিতে (স্থানীয়ভাবে) আহত মানটি হলো ৭৩ এবং সিএমবির (দূরবর্তী ডেটা) ব্যবহার করে পাওয়া, ফলাফলটি হলো ৬৭। এ দুটির মানের পার্থক্য মাত্র ৬ কিলোমিটার/সেকেন্ড/মেগাপারসেক হলেও সেটি মহাবিশ্বের প্রসারণের প্রক্রিয়াকে আমরা যে ঠিক বুঝতে পারছি না, সেটাকে নির্দেশ করে।

এবার দেখা যাক টাইমস্কেপ মডেল কীভাবে এটার সমাধান করতে পারে। এই মডেল বলছে, মহাবিশ্বের আদিতে শূন্যস্থানের পরিমাণ বেশি ছিল না, বস্তুর ঘনত্ব বেশি ছিল, অর্থাৎ সবকিছু প্রাচীরই ছিল। আর বর্তমানে, আমাদের সময়ে, মহাবিশ্বে প্রচুর ফাঁকা জায়গার আবির্ভাব হয়েছে। তাই স্থানীয়ভাবে যখন আমরা হাবল পরিমাপ নির্ধারণ করতে চাই, তখন শূন্যস্থানগুলোর প্রভাব চলে আসে, যেখানে মহাবিশ্ব তুলনামূলকভাবে দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে, তাই হাবল মানটিও একটু বেশি (৭৩)। অন্যদিকে আমরা যখন সিএমবি ব্যবহার করি, তখন প্রারম্ভিক মহাবিশ্বকেও বিশ্লেষণে ধরতে হয়। সেই সময়কার মহাবিশ্বে প্রাচীরের পরিমাণ বেশি ছিল, যেখানে সময়ের বহমানতা শ্লথ ছিল। সেটিকে আমাদের স্থানীয় মহাবিশ্বের সঙ্গে গড় করলে মানটির পরিমাণ কমে আসে (৬৭)। এভাবে হয়তো টাইমস্কেপ মডেলটি পর্যবেক্ষণের বিভ্রমের ভিত্তিতে হাবল দ্বন্দ্বের সমাধান করতে পারে।

এ সময়ে টাইমস্কেপ মডেলটি আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্পের পথ দেখাচ্ছে, যা কিনা মহাবিশ্বকে ডার্ক এনার্জি ছাড়াই ব্যাখ্যা করবার একটা সুযোগ দিচ্ছে। এটি সত্যি হলে আমরা সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যতা (ফাইন টিউনিং) এবং হাবল দ্বন্দ্বেরও সমাধান পাব। কিন্তু বৃহত্তর বিজ্ঞানসমাজে এটির গ্রহণযোগ্যতা এ মডেল দিয়ে মহাবিশ্বের সামগ্রিক বিশাল কাঠামো ও সুপারনোভা ডেটার আরও বিশ্লেষণের ওপর নির্ভরশীল। ডার্ক এনার্জি একটি সত্যিকারের ভৌত অস্তিত্ব, নাকি মহাজাগতিক পর্যবেক্ষণজনিত বিভ্রম—এটি আধুনিক বিজ্ঞানের জন্য একটি উন্মুক্ত ও কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন। সে প্রশ্নের সমাধান জানতে আমরা সবাই উন্মুখ হয়ে আছি।

লেখক : অধ্যাপক, মোরেনো ভ্যালি কলেজ, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

সারা বছর সেরা বই

নতুন বই

৳ ৪২৫

আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

জিরো দ্য বায়োগ্রাফি অব আ ডেঞ্জারাস আইডিয়া

নতুন বই

৳ ৪২০

ইশতিয়াক হোসেন চৌধুরী

এক্সোপ্ল্যানেট বহিঃসৌরগ্রহের খোঁজে

নতুন বই

৳ ৪০০

আবুল বাসার

আবিষ্কারের কাহিনি দুনিয়া পাল্টানো সাতটি আবিষ্কার এবং কয়েকজন বিজ্ঞানী

নতুন বই

৳ ৪২০

ওয়াল্টার লুইন

ভাষান্তর : আবুল বাসার

ফর দ্য লাভ অব ফিজিকস

নতুন বই

৳ ৬০০

সম্পাদক : মুনির হাসান

সংকলন : নাফিস তিহাম

বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াডের যত প্রশ্ন

নতুন বই

৳ ৪৫০

রিচার্ড ফাইনম্যান

অনুবাদ : উচ্ছ্বাস তৌসিফ

দ্য ক্যারেক্টার অব ফিজিক্যাল ল

নতুন বই

৳ ৩০০

কাজী আকাশ

ঝটপট গণিত

সহজ কলাকৌশল

প্রথমার আরও বই

আবুল বাসার

- **মহাজাগতিক প্রথম আলো** ৩য় মুদ্রণ ৳ ৫২৫

সম্পাদক : আবুল বাসার

- **চন্দ্রজয়ের ৫০ বছর** ৳ ৩০০

আব্দুল কাইয়ুম

- **আরও গণিত আরও স্মার্ট** ৩য় মুদ্রণ ৳ ৩৪০
- **গণিত আর গণিত** ২য় মুদ্রণ ৳ ৩২০
- **গণিতের জাদু** ১২তম মুদ্রণ ৳ ৪০০
- **গণিতের ধাঁধা** ৫ম মুদ্রণ ৳ ৩০০
- **বিজ্ঞানের রাজ্যে কেন কেন এবং কেন** ৳ ৩৮০
- **প্রশ্নোত্তরে বিজ্ঞানের কী ও কেন** ২য় মুদ্রণ ৳ ৩৫০
- **মজার গণিত** ৫ম মুদ্রণ ৳ ২৯০
- **সরস গণিত** ৩য় মুদ্রণ ৳ ৩০০

দীপেন ভট্টাচার্য

- **আকাশ পর্যবেক্ষকের নোটবই** ৩য় মুদ্রণ ৳ ৩০০

নাফিস তিহাম

- **গণিত অলিম্পিয়াড** ১০১ সমস্যা ও সমাধান ৭ম মুদ্রণ ৳ ২৮০

নীল ডিগ্র্যাস টাইসন ও গ্রেগরি মোন। অনুবাদ : আবুল বাসার

- **অ্যাস্ট্রোফিজিকস** সহজ পাঠ ৬ষ্ঠ মুদ্রণ ৳ ৩৫০

পল ডেভিস

অনুবাদ : আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

- **দ্য লাস্ট থ্রি মিনিটস** ৩য় মুদ্রণ ৳ ৩০০

পিটার অ্যাটকিনস

অনুবাদ : উচ্ছ্বাস তৌসিফ

- **রসায়ন** সহজ পাঠ ২য় মুদ্রণ ৳ ৪০০

স্টিফেন হকিং ও লিওনার্ড ম্লোডিনো। অনুবাদ : আবুল বাসার

- **দ্য গ্র্যান্ড ডিজাইন** ২য় মুদ্রণ ৳ ৪০০

ঘরে বসে বই পেতে ভিজিট করুন

www.prothoma.com ০১৭৩০০০০৬১৯

প্রথমা প্রকাশন

● ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা। ০১৯৫৫ ৫৫২১৭৭ ●৪৩-৪৪ আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। ০১৯৫৫ ৫৫২১৭৬ ●শেফ'স টেবিল, ইউনাইটেড সিটি, ঢাকা। ০১৭৩০ ০০০৬০০ ●মান্নান মার্কেট, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা। ০১৭৩০ ০০০৬৪৮ ●ইউনিমার্ট বিল্ডিং, আম্বরখানা, সিলেট। ০১৭০৮ ৪৩৫৫৭৯

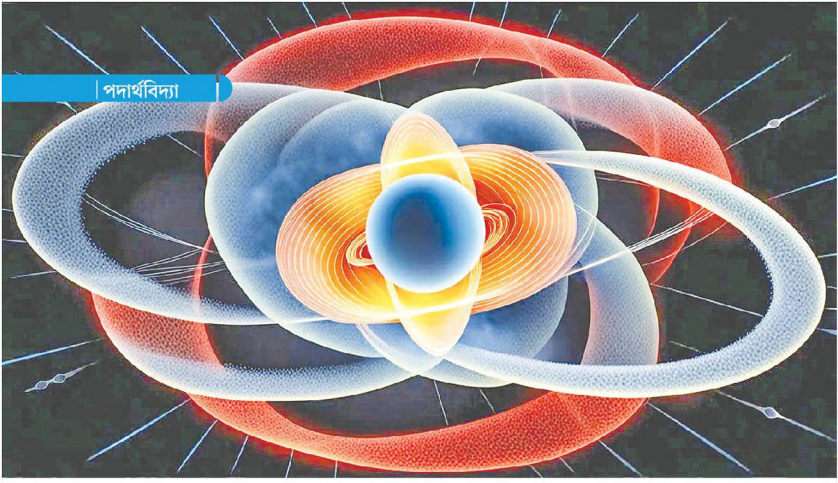

নিউক্লিয়ার বলের কাহন

পর্ব ১

আরশাদ মোমেন

গুগল সার্চ, পাঠ্যবই বা জনপ্রিয় ধারার লেখায় পরমাণুর যে আকারটি দেখানো হয়, তা কতটা সঠিক? পরমাণুর ভেতরের কলকব্জা, এর আকার, রাদারফোর্ডের নিউক্লিয়াস শনাক্ত করার সেই বিখ্যাত পরীক্ষা এবং এর মাধ্যমে নিউক্লিয়ার বলের সূত্রপাত—তাত্ত্বিক পদার্থবিদ আরশাদ মোমেনের সঙ্গে চলুন, পরমাণুর গহিনে যাত্রা করা যাক।

আমরা বরাবরই শুনে এসেছি, মহাবিশ্বে মৌলিক বলের সংখ্যা চারটি। মহাকর্ষ, বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় আর দুই ধরনের নিউক্লীয় বল, যাদের আমরা সবল আর দুর্বল নাম দিয়ে দুই ক্যাটাগরিতে ভাগ করি। প্রথম দুটি বলের সঙ্গে আমরা ঐতিহাসিকভাবেই পরিচিত, বিশেষত নিউটন আর ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণের কল্যাণে।

অন্যদিকে বাকি দুটি বলের উপস্থিতি বোঝার জন্য আমাদের প্রথমে পরমাণুর গঠন জানতে হয়েছিল। রসায়নবিদেরা পরমাণুর ধারণা নিয়ে চিন্তাভাবনা করলেও এর গঠনের সপক্ষে পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে পাওয়া কোনো মোক্ষম তথ্য দিতে পারছিলেন না। এর জন্য আমাদের সবার আগে ইলেকট্রন যে একটি চার্জবিশিষ্ট মৌলিক কণা, এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল। এটি ছিল পুরোপুরিভাবে বিজ্ঞানী টমসনের সাফল্য। এই কণা যেসব মৌলের ভেতর আছে, তা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাঁকে বেশ বুদ্ধি খাটাতে হয়েছিল। এখানে বলে রাখা ভালো, ইলেকট্রনের রশ্মি (যা ক্যাথোড রে বা রশ্মি হিসেবে আগেই পরিচিত ছিল) বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন, কিন্তু তাঁরা একে এক্স-রে বা আলোর মতো নতুন কিছু বলে চিন্তা করতে আগ্রহী ছিলেন। টমসন এই রশ্মির ওপর চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাব খাটিয়ে দেখালেন, এতে ভরবিশিষ্ট কণা রয়েছে। শুধু তা-ই নয়, তাঁর পাওয়া ডেটার বিশেষত্ব ছিল, এই কণার চার্জ ও ভরের অনুপাত একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা এবং এর মান কোন উৎস থেকে এই ক্যাথোড রশ্মি বেরোচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করে না। এভাবে টমসন সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন, এই কণা সব মৌলের মধ্যেই আছে। অতএব এটি একটি মৌলিক কণা।

এখানে যে জিনিসটা আমাদের লক্ষ করা উচিত, তা হলো এখানে টমসন কোনো নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করেননি; বরং সেই সময়ে যা জানা ছিল, তারই বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার তিনি করেছিলেন। এ থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় হলো, ভালো বিজ্ঞান করার জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তির পাশাপাশি আমাদের সমস্যা সমাধান করার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। শুধু তথ্যের সমাহার করলেই বিজ্ঞান হয় না, তথ্যের মধ্যে যোগসূত্র বের করার দায়িত্বও বিজ্ঞানীদের ঘাড়ে বর্তায়। এটাই বিজ্ঞানের মূল কাজ।

যা-ই হোক, এই গল্পের এটা সবে শুরু। পরমাণুর গঠন বুঝতে পারা তখন সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়াল। আর পরমাণু যে অবিভাজ্য, এই ধারণার মৃত্যু ঘটল। আমাদের নিত্যকার অভিজ্ঞতা বলে, পরমাণু সামষ্টিকভাবে চার্জশূন্য, তাই ইলেকট্রন ছাড়াও পরমাণুর মধ্যে বিপরীত চার্জবিশিষ্ট 'কিছু' একটা থাকা প্রয়োজন। সেটা কী, তা বের করার উদ্দেশ্য নিয়ে রাদারফোর্ড (তাঁর ব্যাপারে আগেও এখানে লিখেছি) আলফা কণা—যা রেডিয়ামের মতো ভারী তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে বের হয়, সোনার পাতলা পাতের দিকে তাক করলেন। টমসনের ধারণা ছিল, পরমাণু বোধ হয় আস্ত একটা বেলের মতো (বাইরের খোসা বাদে)। ইলেকট্রনগুলো বেলের বীজের মতো

ভেতরে ছড়ানো-ছিটানো আছে। এখানে বলে রাখা ভালো, রাদারফোর্ড নিজে বসে বসে পরীক্ষাটি করেননি; বরং তাঁর জুনিয়র সহকর্মী গাইগার ও মার্সডেন পরীক্ষাটি করেছিলেন। কিন্তু পরীক্ষার আইডিয়া ও মূল ডিজাইন রাদারফোর্ডেরই মস্তিষ্কপ্রসূত। তবে কার কৃতিত্ব কতটুকু, তা বিচারে না গিয়ে তাঁদের ফলাফলে কী জানা গেল, সেটাই মুখ্য। তা হলো পরমাণুতে নিউক্লিয়াসের উপস্থিতি; যার মধ্যে পরমাণুর ভরের ৯৫ শতাংশের বেশি এবং ধনাত্মক চার্জের সবটাই অবস্থান করে। কিন্তু এর পাশাপাশি যে উপলব্ধি বিজ্ঞানীদের হলো—নিউক্লিয়াসের আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র, পরমাণুর তুলনায় প্রায় ১০ লাখ ভাগ ছোট! আমাদের আঁকা বেশির ভাগ চিত্রই নিউক্লিয়াসে আকারের ওপর যে সুবিচার করে না, তা গুগলে 'অ্যাটম পিকচার' (Atom picture) লিখে সার্চ দিলেই প্রতীয়মান হয়। আমার করা সার্চে যে ছবিটা সবার আগে উঠে এল, তা এখানে যোগ করলাম (ছবি ১)।

শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ করে আঁকা এই ছবিতে মোটাদাগে আকারগত দুটি ধারণা ঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়নি। ১. ইলেকট্রনকে গোলকের মতো করে দেখানো হয়েছে, যার একটা আকার রয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে, তাতে ইলেকট্রনের কোনো আকার-আয়তন ধরা পড়েনি। ইলেকট্রনকে বিন্দুসম দেখানোই যথাযথ হতো। ২. নিউক্লিয়াসের আকারও ইলেকট্রনের তুলনাগতভাবে অত্যন্ত বড় দেখানো হয়েছে।

এদের অনুপাত শুধু ১০ লাখ ভাগ বললে বোধ হয় আমরা ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে অনুভব করতে পারব না। তাই একটি তুলনা দিই। যদি নিউক্লিয়াসের ব্যাস হয় ১ সেন্টিমিটার (একটি মোটরদানার সমান), তাহলে পরমাণুর ব্যাস হবে ১০৪ মিটার বা ১০ কিলোমিটার! অথচ এত ক্ষুদ্র জায়গার মধ্যেই পরমাণুর সব ভর রয়েছে। তার মানে আমরা সাদা চোখে যে পদার্থ দেখি, তার বেশির ভাগই ফাঁকা। আর যদি আমরা এই নিউক্লিয়াসকে 'দেখতে' চাই, তাহলে ১০ কিলোমিটার দূরত্ব থেকে ১ সেন্টিমিটার আকারের কোনো বস্তুকে আলো বা আলোসদৃশ কিছু দিয়ে আঘাত করতে হবে। একজন অলিম্পিক শুটিংয়ে পদকজয়ীর পক্ষেও এটা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ হবে।

রাদারফোর্ডের গবেষণা দল যে নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করতে পেরেছিল, সেটা একটা সৌভাগ্য বললে অত্যুক্তি

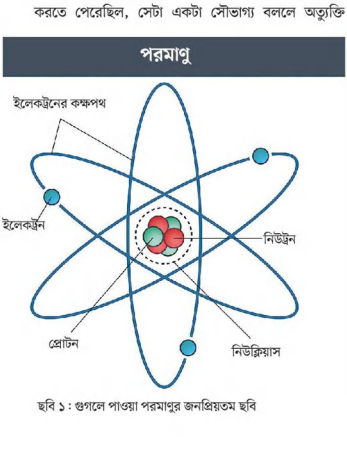

ছবি ১ : গুগলে পাওয়া পরমাণুর জনপ্রিয়তম ছবি

ছবি ২ : একজন সেকালের পদার্থবিজ্ঞানী

হবে না। কারণ, তারা পরমাণুর ভেতরটা দেখার জন্য সে সময় সর্বোচ্চ পাওয়া কণা, তথা আলফা কণার রশ্মি ব্যবহার করেছিল। কী চিন্তাধারা থেকে রাদারফোর্ড এই পরীক্ষা করার চিন্তা করেছিলেন, তা এত দিন পর আমাদের সঠিকভাবে হলফ করা হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি বিজ্ঞানীদের স্বভাবজাত কৌতূহল থেকেই এই কাজ করতে গিয়েছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পদার্থবিজ্ঞানে রিডাকশনিজম (Reductionism) বলে একটা ধারা চালু আছে। গালভরা একটা নাম হলেও ব্যাপারটা অনেকটা সোজা। এর মোদ্দাকথা হলো, কোনো মেশিন বা যন্ত্র কীভাবে কাজ করে, তা বুঝতে হলে এই ধারায় আমাদের করণীয় হবে প্রথমে মেশিনের পার্টস বা বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করা এবং তারপর প্রতিটি অংশ কীভাবে কাজ করে, তা জানা। সর্বশেষ বিভিন্ন অংশের মধ্যে কী সম্পর্ক রয়েছে, তা বের করা। এই চিন্তাধারায় আমরা বরাবরই অনেকটা কার্টুনের গদাধারী গুহামানবের মতো কাজ করি (ছবি ২), অর্থাৎ নতুন কিছু সামনে এলেই আমরা হাতে থাকা সবচেয়ে ভারী গদা দিয়ে আঘাত করে ভেতরে কী আছে, তা জানতে চেষ্টা করি।

বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে রাদারফোর্ডের অনুসৃত পদ্ধতিটি এই রিডাকশনিজমেরই প্রতিফলন। আর তাঁর গবেষণা দল ওই সময়ের সবচেয়ে ভারী গদাই ব্যবহার করেছিল।

নিউক্লিয়াস আবিষ্কারের পর স্বভাবতই পরবর্তী প্রশ্ন দাঁড়াল, 'নিউক্লিয়াস আবার কী দিয়ে তৈরি?' এটার উত্তর পেতে অবশ্য বিজ্ঞানীরা বেশি কষ্ট করেননি। সবচেয়ে হালকা পরমাণুর নিউক্লিয়াস যা, সেটাকেও একটি মৌলিক কণার আসনে বসিয়ে দিলেন, নাম দেওয়া হলো প্রোটন। স্বভাবতই এই প্রোটন দিয়ে সব নিউক্লিয়াস তৈরি, এ ধারণাই সামনে আসা শুরু হলো।

সমস্যা হলো, প্রোটনের তো বৈদ্যুতিক চার্জ রয়ে গেছে—সবার চার্জও একই, তাদের মধ্যে বিকর্ষণ বল বিদ্যমান। নিউক্লিয়াসের মধ্যে সব প্রোটন একসঙ্গে থাকে কী করে? তার মানে নিশ্চয়ই আরও শক্তিশালী কোনো আকর্ষণ বল নিউক্লিয়াসের মধ্যে রয়েছে, যা এর পেছনে দায়ী। মোটাদাগে, এভাবেই নিউক্লিয়ার বল আমাদের চিন্তাধারার মঞ্চে অনুপ্রবেশ করল। কিন্তু এই নাটকের মধ্যে আরও চড়াই-উতরাই সামনে রয়েছে। আমরা তার অপেক্ষায় থাকি, ঠিক আছে?

লেখক : অধ্যাপক, ফিজিক্যাল সায়েন্সেস বিভাগ, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ

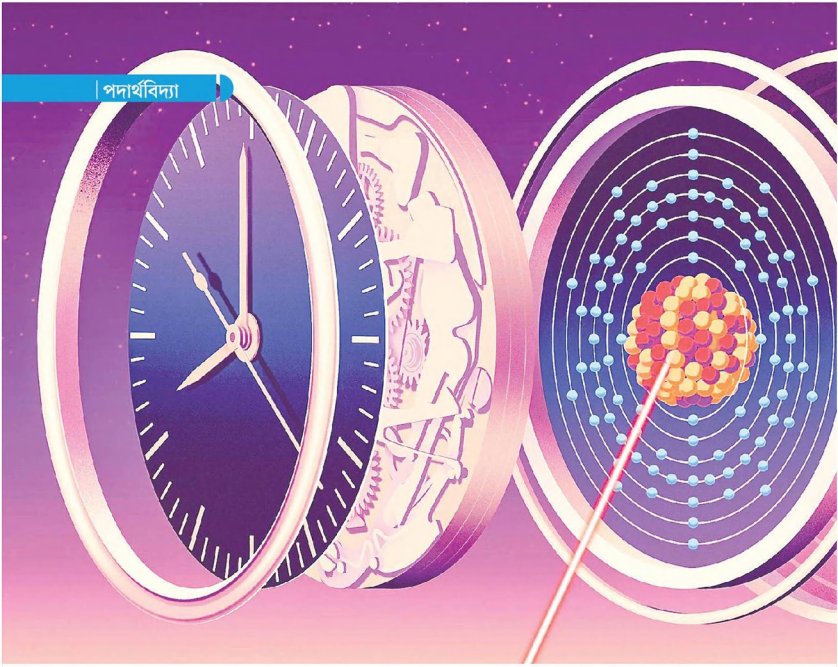

নিউক্লিয়ার ঘড়ি

প্রদীপ দেব

ইলেকট্রনের শক্তিস্তরের বিকিরণ কাজে লাগিয়ে বানানো হয়েছে বর্তমান পৃথিবীর নিখুঁততম ঘড়ি—পারমাণবিক ঘড়ি। কিন্তু প্রোটন বা নিউট্রনের শক্তিস্তরের বিকিরণও কি একইভাবে কাজে লাগানো যায়? সে ক্ষেত্রে বানানো যেতে পারে আরও নিখুঁত নিউক্লিয়ার ঘড়ি। এই ঘড়ি বদলে দিতে পারে স্যাটেলাইট, জিপিএসসহ আধুনিক যোগাযোগপ্রযুক্তির খোলনলচে...

মানবসভ্যতা বিকাশের শুরু থেকেই সময় সম্পর্কে মানুষ সচেতন হতে শুরু করেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগতভাবে আধুনিক হচ্ছে, তত সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতরভাবে উদ্ভাবিত হচ্ছে সময় মাপার কলাকৌশল। প্রাচীনকালে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করেই চলত সময় মাপার কাজ। যেমন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এক দিন, সূর্যাস্ত থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় পর্যন্ত এক রাত। চাঁদ পর্যবেক্ষণ করে মাসের হিসাব, ঋতু পরিবর্তন দেখে বছরের হিসাব। তারপর দিনের সময়কে বিভিন্নভাবে ভাগ করে মাপার জন্য সূর্যের ছায়া ব্যবহার করে উদ্ভাবিত হলো সূর্যঘড়ি। পানিপ্রবাহের হারের সঙ্গে তুলনা করে প্রাচীন মিসর, চীন ও মধ্যপ্রাচ্যে ব্যবহার করা হতো জলঘড়ি। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উদ্ভাবিত হয় যান্ত্রিক ঘড়ি। ১৬৫৬ সালে ওলন্দাজ (ডাচ) পদার্থবিদ ক্রিশ্চিয়ান হাইগেনস উদ্ভাবিত পেন্ডুলাম ঘড়ি সময় পরিমাপে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের সময় থেকে চালু হয় ব্যক্তিগত সময় মাপার জন্য ছোট আকারের পকেটঘড়ি ও হাতঘড়ি। বিংশ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞানীরা মনোযোগ দেন সময়ের পরিমাপকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার দিকে। সে পথ ধরেই উদ্ভাবিত হয় পারমাণবিক ঘড়ি বা অ্যাটমিক ক্লক।

পারমাণবিক ঘড়ি কাজ করে পরমাণুর স্বাভাবিক দোলন কাজে লাগিয়ে। পারমাণবিক ঘড়ি পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের শক্তিস্তর পরিবর্তনের সময় নির্গত বা শোষিত মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের কম্পাঙ্ক পরিমাপ করে। এই কম্পাঙ্ক সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। পারমাণবিক ঘড়ির আদর্শ পরমাণু হিসেবে ব্যবহৃত হয় সিজিয়াম পরমাণুর সিজিয়াম-১৩৩ আইসোটোপ। সিজিয়াম-১৩৩ পরমাণুকে কিছুটা উত্তপ্ত করে গ্যাসে পরিণত করে একটি ধাতব প্রকোষ্ঠে চালনা করা হয়। সেখানে মাইক্রোওয়েভ জেনারেটর থেকে নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের মাইক্রোওয়েভ পাঠানো হয়। মাইক্রোওয়েভের কম্পাঙ্ক পরমাণুর

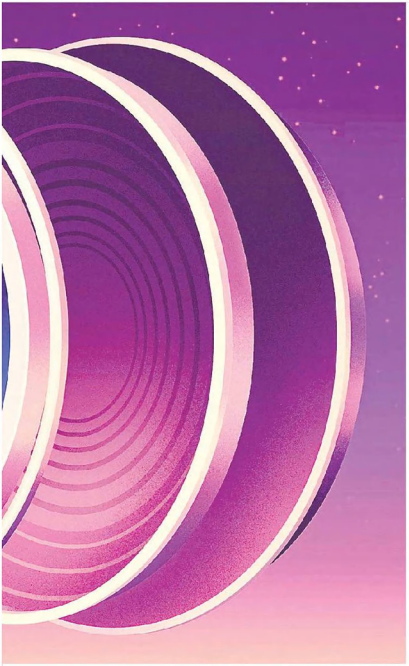

কম্পাঙ্কের সঙ্গে মিলে পরমাণুর ইলেকট্রন শক্তি শোষণ করে এবং উচ্চতর শক্তিস্তরে চলে যায়। পরমাণুর ইলেকট্রন কতটা শক্তি শোষণ করল এবং কতগুলো ইলেকট্রন উত্তেজিত হয়ে নিজেদের শক্তিস্তর অতিক্রম করল, তা একটি ডিটেক্টর দিয়ে পরিমাপ করা হয়। মাইক্রোওয়েভের কম্পাঙ্ক এমনভাবে পরিবর্তিত হয়, যেন পরমাণুর কম্পাঙ্ক ও মাইক্রোওয়েভের কম্পাঙ্ক মিলে সর্বোচ্চ রেজোন্যান্স বা অনুনাদ পাওয়া যায়। রেজোন্যান্স ফ্রিকোয়েন্সি বা অনুনাদ কম্পাঙ্ক নির্দিষ্ট হওয়ার পর সেই কম্পাঙ্কের মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করে কোয়ার্টজ দোলক চালু করা হয়, যা ঘড়ির দোলক হিসেবে নির্ভুলভাবে কাজ করে।

পারমাণবিক ঘড়ি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে নির্ভুলভাবে সময় পরিমাপ করে। এর অনিশ্চয়তার মাত্রা এত কম যে সিজিয়াম পারমাণবিক ঘড়ির সময়ের ক্ষেত্রে এক কোটি বছরে মাত্র এক সেকেন্ড তারতম্য ঘটে।

পরিমাপের যে সাতটি মৌলিক একক আছে, সেগুলোর মধ্যে সময়ের একক 'সেকেন্ড'-এর সর্বশেষ সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে পারমাণবিক ঘড়ির ভিত্তিতে। এক সেকেন্ড হলো সেই সময়কাল, যাতে সিজিয়াম-১৩৩ পরমাণুর গ্রাউন্ড স্টেটের দুটি অতি সূক্ষ্ম মাত্রার মধ্যে পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিকিরণের ৯১৯ কোটি ২৬ লাখ ৩১ হাজার ৭৭০টি পূর্ণদোলন সম্পন্ন হয়।

বর্তমান তথ্য যোগাযোগের যুগে নেটওয়ার্কের সময়ের সমন্বয়, জিপিএসসহ অত্যন্ত সময়সংবেদী সব বৈজ্ঞানিক কাজকর্মে এই পারমাণবিক ঘড়ি ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক ঘড়ির এত সঠিক মাপেও পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন। পরমাণুর ইলেকট্রনের শক্তিস্তরের বিকিরণের কম্পাঙ্ক যদি কাজে লাগানো যায়, তবে নিউক্লিয়াসের প্রোটন বা নিউট্রনের

এরপর ২০ বছরের বেশি সময় ধরে হাজার রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অবশেষে ২০২৪ সালে এসে নিউক্লিয়ার ঘড়ির ধারণা বাস্তবে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে

শক্তিস্তরের বিকিরণকেও তো একইভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। তাহলে তো নিউক্লিয়ার ঘড়ি তৈরি করা সম্ভব। বিজ্ঞানীরা এ ধারণাকেই বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য কাজ করছেন ২০ বছরের বেশি সময় ধরে।

জার্মান পদার্থবিদ একেহার্ড পেইক ও ক্রিশ্চিয়ান টাম ২০০১ সালে প্রথম প্রস্তাব করেছিলেন পারমাণবিক ঘড়ির চেয়েও সঠিকভাবে সময় মাপার সক্ষমতাসম্পন্ন নিউক্লিয়ার ঘড়ির। তাঁরা আশা করেছিলেন, অতিদ্রুত নিউক্লিয়ার ঘড়ি তৈরি করা সম্ভব হবে। প্রাথমিক ধারণা-সম্পর্কিত গবেষণাপত্র তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন ২০০৩ সালে [১]। কিন্তু এরপর ২০ বছরের বেশি সময় ধরে হাজার রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অবশেষে ২০২৪ সালে এসে নিউক্লিয়ার ঘড়ির ধারণা বাস্তবে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে [২,৩,৪]।

নিউক্লিয়ার ঘড়ি তৈরি করতে গেলে কী ধরনের নিউক্লিয়াস দরকার, তা বোঝার জন্য দেখা যাক নিউক্লিয়ার ঘড়ির কলকবজা ও কার্যপদ্ধতি কী। নিউক্লিয়ার ঘড়ির মূলনীতিও পারমাণবিক ঘড়ির মূলনীতির মতোই। যথোপযুক্ত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে লেজারের মাধ্যমে উত্তেজিত করার পর উত্তেজিত শক্তিস্তর থেকে বিকিরণ নির্গত হবে। সেই বিকিরণের পরিমাণ গামা রে ডিটেক্টরের মাধ্যমে শনাক্ত ও পরিমাপ করে একই শক্তির কম্পাঙ্কবিশিষ্ট একটি কোয়ার্টজ দোলক দোলানো হবে, যা থেকে ঘড়ির সময় মাপা যাবে।

পারমাণবিক ঘড়ির ক্ষেত্রে সিজিয়াম-১৩৩, রুবিডিয়াম-৮৭, হাইড্রোজেন, স্ট্রনশিয়াম, ইটারবিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম আয়ন, মারকারি আয়ন ইত্যাদি বেশ

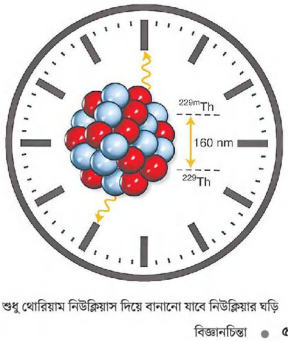

শুধু থোরিয়াম নিউক্লিয়াস দিয়ে বানানো যাবে নিউক্লিয়ার ঘড়ি

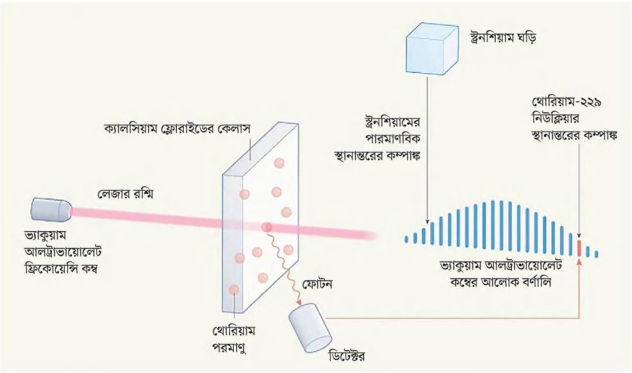

নিউক্লিয়ার ঘড়ির মূলনীতি

কয়েকটি পরমাণু বা পরমাণুর আইসোটোপ ব্যবহার করে সফলভাবে পারমাণবিক ঘড়ি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু নিউক্লিয়াসের যে শক্তিস্তর ব্যবহার করে নিউক্লিয়ার ঘড়ি তৈরি করা যাবে, সে রকম নিউক্লিয়াসের সংখ্যা খুব কম। এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত ১১৮টি মৌলের প্রায় সাড়ে ৩ হাজার আইসোটোপের নিউক্লিয়াসের মধ্যে ১ লাখ ৭৬ হাজার রকমের উত্তেজিত শক্তিস্তর বিশ্লেষণ করে এখন পর্যন্ত মাত্র ১টি পারমাণবিক নিউক্লিয়াস পাওয়া গেছে, যার উত্তেজিত শক্তিস্তর থেকে নিউক্লিয়ার ঘড়ি তৈরি করা সম্ভব [৫]। সেই নিউক্লিয়াসটি হলো থোরিয়াম-২২৯।

ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড ক্রিস্টালের মধ্যে থোরিয়াম-২২৯ পরমাণু যুক্ত করে সেখানে আলট্রাভায়োলেট লাইট বা অবলোহিত আলোর কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের লেজার বিম প্রয়োগ করা হয়। লেজার থেকে শক্তি শোষণের ফলে থোরিয়াম-২২৯ নিউক্লিয়াসের প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। থোরিয়াম-২২৯ নিউক্লিয়াসের উত্তেজনা আইসোম্যারিক স্টেট তৈরি করে। অর্থাৎ উত্তেজিত অবস্থায় এরা কিছুক্ষণ থাকার পর শক্তি নির্গমনের মাধ্যমে উত্তেজনা কমায়, ফিরে আসে গ্রাউন্ড স্টেটে। নিউক্লিয়াস থেকে শক্তি নির্গমন ঘটে গামা রে বিকিরণের মাধ্যমে। একটি গামা রে ডিটেক্টর এই শক্তি নির্গমনের হার পরিমাপ করে। এই নিউক্লিয়ার গামা রশ্মির শক্তি পারমাণবিক বিকিরণের চেয়ে অনেক বেশি। ফলে তাকে কম্পাঙ্কে পরিণত করলে কম্পাঙ্কের পরিমাণ হয় পারমাণবিক কম্পাঙ্কের চেয়ে প্রায় ১০ হাজার গুণ বেশি। এই কম্পাঙ্কের সঙ্গে অনুরণন ঘটিয়ে যখন একটি কোয়ার্টজকে দোলানো হয়, তখন সেই দোলন পারমাণবিক দোলকের চেয়ে ১০ হাজার গুণ বেশি দোলে। এই দোলনকে যখন ঘড়ির সময় মাপার কাজে লাগানো হয়, তা স্বাভাবিকভাবেই পারমাণবিক ঘড়ির সময়ের চেয়ে বেশি সঠিক হবে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন, ১ হাজার ৪০০ কোটি বছরেও ১ সেকেন্ডের তারতম্য ঘটবে না নিউক্লিয়ার ঘড়ির সময়ে।

নিউক্লিয়ার ঘড়ি কী কাজে লাগবে? আমরা যাঁরা সাধারণভাবে যেকোনো ঘড়িতে সময় দেখে জীবন চালাতে অভ্যস্ত, যাঁদের কাছে সেকেন্ডের হেরফেরে তেমন কিছু যায়-আসে না, তাঁদের জন্য নিউক্লিয়ার ঘড়ির অবদান খুব একটা দৃশ্যমান হবে না। কিন্তু নিউক্লিয়ার ঘড়ি তৈরি সম্ভব হলে বৈজ্ঞানিকভাবে অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি ঘটবে। যেমন স্যাটেলাইট নেভিগেশন সিস্টেমের অনিশ্চয়তার মাত্রা অনেক কমে যাবে। সাধারণ জিপিএস সিস্টেমে কোনো বস্তুর অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ৩ থেকে ১০ মিটারের একটা অনিশ্চয়তা থাকে। এই অনিশ্চয়তার পরিমাণ অনেক কমে যাবে জিপিএস সিস্টেমে নিউক্লিয়ার ঘড়ি ব্যবহার করা গেলে।

বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানে নিউক্লিয়ার ঘড়ি বড় ভূমিকা রাখবে। বর্তমান মহাবিশ্বের রহস্য সন্ধানে নিয়োজিত স্যাটেলাইটগুলো পারমাণবিক ঘড়ির সময়ের সঙ্গে সংযুক্ত। ফলে মহাবিশ্বের তড়িৎ-চৌম্বকক্ষেত্রের একটা সূক্ষ্ম প্রভাব পড়ে। অতি সূক্ষ্ম মাত্রার হলেও মাঝেমধ্যে কিছু বিচ্যুতি ঘটে সময়ের পরিমাপে। নিয়মিতভাবে তার সংশোধনের দরকার হয়। নিউক্লিয়ার ঘড়ি এসব থেকে মুক্ত হবে। ফলে ভবিষ্যতের স্যাটেলাইটগুলো হবে আরও অনেক বেশি সুসংবেদী ও সুচারু।

ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি শনাক্ত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ে উৎক্ষেপিত স্যাটেলাইটগুলো। পারমাণবিক ঘড়ির নেটওয়ার্কের সঙ্গে সেগুলো সংযুক্ত। নিউক্লিয়ার ঘড়ি সেসব ক্ষেত্রে আরও অনেক বেশি সঠিক মাত্রার ভূমিকা রাখতে পারবে।

নিউক্লিয়ার ঘড়ি এখনো তৈরি হয়নি। তবে আশা করা যাচ্ছে, ২০২৫ সালের মধ্যে প্রথম নিউক্লিয়ার ঘড়ি তৈরি করা সম্ভব হবে।

লেখক : শিক্ষক ও গবেষক, আরএমআইটি, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া

সূত্র : ১. *ইউরোফিজিকস লেটার*, ভলিউম ৬১, ২০০৩।
২. *নেচার*, ভলিউম ৬৩৬, ১৯/২৬ ডিসেম্বর ২০২৪, পৃ ৫৪৪-৪৫।
৩. *নেচার*, ভলিউম ৬৩৩, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, পৃ ৪৩-৪৫।
৪. *ফিজিকস ওয়ার্ল্ড*, নভেম্বর ২০২৪, পৃ ৩।
৫. *জার্নাল অব ফিজিকস বি*, ভলিউম ৫২, পেপার ২০৩০০১, ২০১৯।

সূর্যের রংঢং

আবুল বাসার

সূর্যকে আমরা সবাই চিনি। আমাদের অতিচেনা এ নক্ষত্রের রং আসলে কেমন? লাল, হলুদ, সবুজ, নীল নাকি সাদা? হয়তো ভাবতে পারেন, হলুদ। কিন্তু যা চোখে দেখা যায়, তা সব সময় সত্যি হয় না। সূর্যের রঙের রহস্য...

প্রতিদিন পৃথিবীর আকাশে একটা আগুনের গোলা পুব থেকে পশ্চিমে চলে যায়। এ আমাদের অতিচেনা দৃশ্য। এ অগ্নিগোলাকই আমাদের চেনা নক্ষত্র, সৌরজগতের অধিপতি—সূর্য। সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই ঘটে চলেছে এই একঘেয়ে ঘটনা। প্রাচীন মানুষদের কাছে এ দৃশ্য ছিল অতি উদ্ভট আর চমকপ্রদ। তাই তারা সেই অগ্নিগোলক বা সূর্যকে দেবতা ভাবতে শুরু করেছিল। সেই রহস্যময়, শক্তিশালী দেবতার জন্য পূজা-অর্চনারও কমতি ছিল না। এর রেশ এখনো রয়ে গেছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন জাতিতে।

এখন অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞানের হাত ধরে সূর্যের রহস্যের জট অনেকটাই খুলে গেছে। আধুনিক মানুষের কাছে সে দেবতার গরিমা হারিয়েছে বহু আগেই। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, মহাবিশ্বের কোটি কোটি নক্ষত্রের মধ্যে সূর্য স্রেফ একটা মাঝারি মানের নক্ষত্র। অবশ্য তাতে পৃথিবীতে প্রাণের টিকে থাকার জন্য কিংবা শক্তির উৎস হিসেবে সূর্যের অপরিহার্যতা খাটো করা হয় না; বরং তার রহস্যের জটাজালগুলো খোলার কারণেই পৃথিবীতে সূর্যের ভূমিকাটা সঠিকভাবে বোঝা যায়। এককথায়, পৃথিবীর প্রাণ-প্রকৃতি, পরিবেশ, আবহাওয়া, আমাদের জীবন, স্বাস্থ্য, আবেগ—সবকিছুতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব রাখছে এই অগ্নিগোলক।

সূর্য অতি উজ্জ্বল। সারাক্ষণ জ্বলছে গনগন করে। সূর্য থেকে প্রতিমুহূর্তে বেরিয়ে আসছে বিপুল পরিমাণ শক্তি। এ শক্তির উৎস ফিউশন বিক্রিয়া। তাতে তৈরি হচ্ছে বিপুল তাপ, শক্তি ও আলো। সূর্যে উৎপন্ন এ আলো বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ধেয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে। এর মধ্যে ক্ষতিকর কিছু রশ্মি আটকে যায় পৃথিবীর ওজোন স্তরেই। তবে পরিবেশদূষণ, তথা জলবায়ু পরিবর্তনের কুফলে ওজোন স্তর ফুটো হয়ে কিছু ক্ষতিকর রশ্মি নেমে আসে ভূপৃষ্ঠে। এর মধ্যে রয়েছে আলট্রাভায়োলেট বা অতিবেগুনি রশ্মি। আমাদের ত্বক অতিমাত্রায় এ রশ্মির সংস্পর্শে থাকলে ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। সূর্যালোকে আরও আছে অবলোহিত বা অবলাল রশ্মি। ইংরেজিতে একে বলে ইনফ্রারেড। সূর্যের এই আলোর জন্যই আমরা ত্বকে উষ্ণতা অনুভব করি। শীতের রোদ পোহাতে এ কারণেই মজা। অবশ্য যতই আরাম লাগুক, শীতের রোদে ক্ষতিকর আলট্রাভায়োলেটও থাকে।

বলতে পারবেন, সূর্যের প্রকৃত রং কী?

এর উত্তরে বেশির ভাগ মানুষই হয়তো ভুল উত্তর দেবেন। কেউ বলবেন, হলুদ। কেউ বলবেন, লাল। কিন্তু সূর্যের রং হলদে বা লালচে কোনোটাই নয়, বরং সাদা বলা যায়। অবশ্য সেটাও নির্ভর করে রঙের ব্যাখ্যার ওপর; অর্থাৎ আমাদের চোখ রং কীভাবে দেখছে, তার ওপর।

সূর্যের প্রকৃত রং কী

সূর্য চরম উত্তপ্ত একটা গ্যাসীয় গোলক। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্যাটেলাইট ব্যবহার করে সূর্যের বর্ণালি মাপলে দেখা যায়, নক্ষত্রটি বর্ণালির দৃশ্যমান আলো নিঃসরণ করে; অর্থাৎ আলোর বর্ণালির যে অংশটুকু আমরা দেখতে পাই, সেগুলো। এটা কাকতালীয় ব্যাপার নয়। আসলে মানুষের চোখ এমনভাবে অভিযোজিত হয়েছে যে সূর্য যে আলো সবচেয়ে বেশি নিঃসরণ করে, সেটাই আমরা দেখতে পাই। দৃশ্যমান আলো ছাড়াও সূর্য থেকে অতিবেগুনি, অবলোহিত রশ্মি নিঃসৃত হচ্ছে। অবশ্য তার পরিমাণ দৃশ্যমান আলোর মতো বেশি নয়।

কোনো বস্তুর রং আমরা কী দেখতে পাব, তা নির্ভর করে আমাদের দেখার পদ্ধতির ওপর। আমাদের চোখের রেটিনায় দুই ধরনের কোষ থাকে। এদের বলা হয় রড কোষ ও কোন

কোষ। রাতে বা স্বল্প আলোয় দেখার জন্য রড কোষ কাজ করে। আর উজ্জ্বল আলোয় কাজ করে কোন কোষ। এই কোষগুলো রং শনাক্ত করে। বেশির ভাগ স্তন্যপায়ী প্রাণীর চোখে দুই ধরনের কোন কোষ থাকলেও মানুষের চোখে আছে তিন ধরনের। সেগুলো এল, এম এবং এস নামে পরিচিত। এই কোষগুলো যথাক্রমে দৃশ্যমান আলোর দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা লাল, মাঝারি তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা হলুদ ও সবুজ এবং ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা নীল রং দেখার কাজ করে। এল কোনকে লাল কোন কোষও বলা হয়। কারণ, এরা দীর্ঘ বা লম্বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রতি সংবেদনশীল (বেশির ভাগ স্তন্যপায়ীর চোখে এটি নেই)। এম কোনকে বলা হয় সবুজ কোন কোষ। কারণ, তা দৃশ্যমান আলোর মাঝারি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রতি সংবেদনশীল। আর এস কোনকে বলা হয় নীল কোন কোষ। কারণ, তা দৃশ্যমান তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ছোট অংশের প্রতি সংবেদনশীল।

চোখের রেটিনায় ৬০ থেকে ৭০ লাখ কোন কোষ আছে। অন্যদিকে রড কোষ আছে প্রায় ৬০ লাখ থেকে ১ কোটি ২০ লাখ। আমাদের মস্তিষ্ক এসব কোষ থেকে পাওয়া সংকেত এক করে হাজারো রঙের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। কথাটা যত সহজে বললাম, পুরো প্রক্রিয়াটা ততটাই জটিল। কোনো আলো কোন কোষগুলোয় আঘাত করলে বিভিন্ন রঙের আলোর তীব্রতা কেমন, সে সংকেত মস্তিষ্কে পৌঁছায়। সেগুলো তুলনা করে মস্তিষ্ক এদের রং হিসেবে ব্যাখ্যা করে। যেমন যদি এস (বা নীল) ও এম (বা সবুজ) কোন কোষগুলো শক্তিশালীভাবে সক্রিয় হয়, কিন্তু এল (বা লাল)-এর সক্রিয়তা কম থাকে, তাহলে চোখে সবুজাভ রং দেখা যাবে। আবার এস ও এম কোন কোষগুলো কম সক্রিয় হলে এবং এল কোন কোষ শক্তিশালী হলে দেখা যাবে লালচে রং। আর দৃশ্যমান বর্ণালি থেকে আসা আলোর সব কটি যদি সমান উজ্জ্বল হয়, তাহলে আমরা সাদা রং দেখার অনুভূতি পাই। সূর্যের ক্ষেত্রেও ঠিক এটাই ঘটে; অর্থাৎ লাল, নীল ও সবুজ শক্তিশালীভাবে সক্রিয় হয়। তাই সূর্য সাদা দেখায়।

অবশ্য কথাটা আংশিকভাবে সত্য। উত্তরটা মহাকাশে বা আমাদের বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণা ও অন্যান্য পদার্থে আঘাত করার আগে সূর্যের আলোর জন্য সত্য। নভোচারীরা মহাকাশে সূর্যকে সাদা দেখেন। কিন্তু সূর্যের আলো আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল বা বাতাসের মধ্য দিয়ে চলার সময় কিছুটা ঢং করে। মানে রং বদলায়। কারণ, এ আলোর কিছুটা বাতাসে শোষিত হয় কিংবা ছড়িয়ে পড়ে। বাতাস বা বায়ুমণ্ডলে সব রং সমানভাবে প্রভাবিত হয় না। যেমন লালের তুলনায় নীল রং বেশি ছড়িয়ে পড়ে বা বিক্ষিপ্ত হয়। তারও কারণ আছে। আসলে বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর (যেমন লাল) চেয়ে ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো (যেমন নীল) বায়ুমণ্ডলে বেশি ছড়ায়। তাই আকাশ নীল দেখা যায়। আমরা সূর্যের ছড়িয়ে পড়া এই আলোকে আকাশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসতে দেখি, যা আকাশকে রঙিন করে তোলে।

কিন্তু নীলের চেয়ে বেগুনি আলোর ছড়িয়ে পড়ার গুণ বেশি। তাহলে আকাশ বেগুনি দেখায় না কেন? এর কারণ, সূর্য যতটা নীল আলো নিঃসরণ করে, বেগুনি ততটা করে না। বেগুনি আলো তুলনামূলক কম নিঃসৃত হয়। আবার আমাদের চোখও বেগুনির প্রতি অতটা সংবেদনশীল নয়। তাই আকাশ বেগুনি দেখায় না।

আবার সূর্যের আলোয় নীলের চেয়ে বেশি থাকে সবুজ রং। তবু আকাশকে ঘাসের মতো সবুজময় হতে দেখি না কেন? এর কারণও প্রায় একই। মানে সবুজের চেয়ে নীল আলো বেশি ছড়িয়ে পড়ে। এই নীল যদি সূর্যের আলো থেকে সরিয়ে দেওয়া যেত, তাহলে আকাশ দেখাত হিমু রঙের। মানে হলদে।

তা ছাড়া আমাদের মস্তিষ্ক রংকে ব্যাখ্যা করে আপেক্ষিকভাবে। কোনো দৃশ্য দেখার সময় আমরা এক বস্তুকে

> কোনো আলো কোন কোষগুলোয় আঘাত করলে বিভিন্ন রঙের আলোর তীব্রতা কেমন, সে সংকেত মস্তিষ্কে পৌঁছায়। সেগুলো তুলনা করে মস্তিষ্ক এদের রং হিসেবে ব্যাখ্যা করে

অন্যগুলোর সঙ্গে তুলনা করে দেখি। তাই আকাশ যদি নীল দেখায়, তাহলে সূর্যকে কিছুটা হলুদ দেখাতে পারে। কিন্তু সূর্যের রং অনেকেই হলুদ বলে দাবি করলেও তা সত্যি নয়। তা-ই যদি হতো, তাহলে সূর্যের আলোয় সাদা কাগজকে দেখাত হলদে। কারণ, সাদা কাগজ সব আলোই ভালোমতো প্রতিফলিত করতে পারে। (কথাটা উল্টোভাবেও বলা যায়। যে কাগজ সব আলো প্রতিফলিত করে, তাকেই সাদা দেখায়।) সে ক্ষেত্রে সাদা কাগজ থেকে হলুদ রংই প্রতিফলিত হতো, কিন্তু সেটা আসলে সাদাই দেখায়।

তাহলে প্রশ্ন জাগে, সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় সূর্যকে হলুদ বা লাল দেখায় কেন? আসলে দিগন্তের কাছে সূর্য থাকলে তার আলোকে আমাদের চোখে পৌঁছাতে বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে অনেক বেশি পথ পাড়ি দিতে হয়। এ সময়ও নীল আলোই বেশি বিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু এখানে পথ পাড়ির দেওয়ার ক্ষেত্রে দৌড়ে জিতে যায় দীর্ঘ তরঙ্গের আলো; অর্থাৎ লাল বা হলদে আলো। তাই আমাদের চোখে লাল বা হলদে আলো পৌঁছাতে পারে। সে জন্যই এ সময় সূর্য বা আকাশ কিছুটা লালচে (বা হলদে) দেখায়।

সূর্য থেকে কোন রঙের আলো বেশি নিঃসৃত হয়

বলুন তো, সূর্য থেকে কোন আলো বা রশ্মি সবচেয়ে বেশি নিঃসৃত হয়? অবলোহিত? গামা রশ্মি নাকি অন্য কোনো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো? বেশির ভাগ মানুষই এ প্রশ্নের ভুল উত্তর দেবেন নিশ্চিত। এবারও কেউ বলবেন, হলুদ আলো। কেউ বলবেন, লাল আলো। কেউ কেউ সাদা আলোর কথাও বলতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত উত্তর হলো, সবুজ আলো। সূর্য থেকে এটাই সর্বোচ্চ পরিমাণে নিঃসৃত হয়। এই রঙের আলোই সবচেয়ে উজ্জ্বল। এরপরই অবস্থান নীলের। আর লাল অংশটা কিছুটা ফিকে। দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৩৮০ থেকে ৭৮০ ন্যানোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কাকতালীয় মনে হতে পারে, সবুজের অবস্থান আলোর বর্ণালি একদম মাঝখানে। এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৫০০ থেকে ৬০০ ন্যানোমিটার; অর্থাৎ সবুজের এক পাশে রয়েছে বেগুনি, নীল ও আসমানি এবং অন্য পাশে রয়েছে হলুদ, কমলা ও লাল।

কথাটা অনেকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না, তাই তো! ভাবছেন, কথাটা সত্যি হলে তো সূর্যকে সবুজ দেখাত। তা দেখি

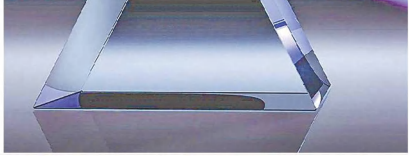

সূর্যের সাদা আলো যে আসলে সাতটি রংয়ের সমাহার, তা প্রমাণ করা যায় প্রিজম ব্যবহার করে

পাতা সূর্যের সাতটি রঙের মধ্যে সবুজ ও হলুদ ছাড়া সবই শোষণ করে

না কেন? তার উত্তর দেওয়ার আগে বলি, সূর্য থেকে সবুজ আলো বেশি নিঃসৃত হয় বলেই রংধনুতে সবুজের এত ছড়াছড়ি। সেখানেও সবুজ রংটাই সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখায়। সূর্যের আলোতে একটা প্রিজম ব্যবহার করে এ কথার সত্যতা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে কেউ। প্রায় ৪০০ বছর আগে বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন প্রিজমের ভেতর দিয়ে সূর্যের আলো চালনা করেন। এর মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন, এ আলো রংধনুর মতো সাতটি আলাদা রঙে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। একটা প্রিজম জোগাড় করতে পারলে পরীক্ষাটা নিজেও হাতে-কলমে করে দেখতে পারবেন। দেখা যাবে, সেসব রঙের মধ্যে সবুজই জ্বলজ্বল করবে সবচেয়ে বেশি।

তাহলে জরুরি প্রশ্নটা হলো, সূর্য সবুজ দেখায় না কেন? এর সরল উত্তর আগেও আলোচিত হয়েছে। কারণ, আমাদের চোখ এমন, যাতে সূর্যের মৌলিক রং—অর্থাৎ সবুজ, লাল ও নীল একসঙ্গে রেটিনায় আঘাত করলে পুরো মিশ্রণটি সাদা হিসেবে ধরা পড়ে। সাদা মানে, এতে সব রংই আছে।

এ কথা মাথায় রেখে সবুজ ঘাস বা গাছের সবুজ পাতা দেখে অনেকে ভুল ভেবে বসতে পারেন (পাতার উপাদান ক্লোরোফিল নামের সবুজ এক যৌগ)। অনেকে হয়তো যুক্তির সিঁড়ি বেয়ে সিদ্ধান্ত পৌঁছাবেন যে উদ্ভিদজগৎ সূর্যের সবুজ রংটাই বেশি পছন্দ করে। তাই তাদের রং এমন সবুজময়। কিন্তু পাতা, গাছপালা বা ঘাস মোটেও সবুজ রং পছন্দ করে না। বরং সূর্যের নীল ও লাল তরঙ্গদৈর্ঘ্যটাই তাদের বেশি পছন্দের। এই দুই আলো শোষণ করেই তারা সম্পন্ন করে খাদ্য উৎপাদনের জন্য সালোকসংশ্লেষণের মতো জটিল প্রক্রিয়া। বিপরীতে সূর্যালোকের সবুজ অংশটা প্রতিফলিত করে। তাই ঘাসে ছাওয়া মাঠটাকে আমরা সবুজ দেখি। তখন আমাদের মনে হয়, 'পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে' (জীবনানন্দ দাশ)।

আসলে কোনো বস্তু আলোর যে অংশ বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যটা শোষণ করে, তা আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু যে অংশটা প্রতিফলিত করে, সেটা দেখতে পাই। যেমন কালো রঙের বস্তু আসলে সব রং শোষণ করে, তাই সেটা কালো। সাদা বস্তু তার ওপর পড়া সব রং প্রতিফলিত করে, তাই সেটা চোখে সাদা হয়ে ধরা পড়ে। একইভাবে কোনো বস্তু লাল হওয়ার অর্থ, বস্তুটা সব রং শোষণ করলেও একমাত্র লাল রংটাই প্রতিফলিত করছে। একইভাবে ঘাস বা গাছের কাছে সূর্যের আলোর যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যটা বা অংশটা অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয়, সেটাই আমাদের চোখে ধরা পড়ে সবুজ হয়ে।

যা-ই হোক, সূর্যের এই বিশেষ গুণের কারণে আমাদের মধ্যে একধরনের পক্ষপাত আছে। একে বলা চলে সূর্যের প্রতি পক্ষপাত বা সান বায়াস। রাতের আকাশে তাকালে গ্রহগুলো দেখে স্বস্তি। রাতের তারাভরা আকাশে তাকিয়ে পার্থিব মুগ্ধতায় ভরে ওঠে মন, জুড়ায় চোখও। আকাশের সব নক্ষত্রই প্রায় একই ধরনের আলো নিঃসরণ করে। সেগুলোও আমাদের সূর্যের মতো একই রঙের সমন্বয়ে গঠিত। কাজেই বলা যায়, আমরা সূর্যের চোখে মহাবিশ্ব দেখি। কারণ, আমাদের রেটিনা ও মস্তিষ্কে সূর্য-চশমা আঁটা।

সূর্যের শক্তির সর্বোচ্চ অংশ সবুজ আলো হওয়ায় এ রং আমরা সবচেয়ে সহজে অনুভব করতে পারি। গোধূলিবেলায়, আলো যখন ঘোলাটে হয়ে যায়, রংগুলো প্রায় বিবর্ণ হয়ে পড়ে, তখনো ঘাস বা গাছের পাতা সবুজ দেখতে পাই। কিন্তু লাল জামা ও বেগুনি ফুলগুলো আমাদের চোখে ধূসর লাগে। রাতের বেলা আমরা যে বেশির ভাগ বস্তুর প্রকৃত রং বুঝতে পারি না, এটাই তারই প্রথম ধাপ। একে সাময়িক বর্ণান্ধতা বলা যায়।

শহরের কৃত্রিম আলো থেকে অনেক দূরের কোনো গ্রামে পূর্ণিমা দেখার অভিজ্ঞতা হয়তো অনেকেরই আছে। পূর্ণ চাঁদের এই জোছনায় পৃথিবীকে দেখা যায় সবজে নীল বা ফিরোজা রঙের। প্রশ্ন হলো, সাদা চাঁদের আলোয় সবকিছু এমন ফিরোজা রঙের হয়ে ওঠে কেন?

সে উত্তর দেওয়ার আগে আরেকটা কথা বলে নিই। আলোকচিত্রী, চিত্রশিল্পী ও সিনেমার নির্মাতারা চাঁদের আলোর এই অদ্ভুত প্রভাব সম্পর্কে খুব ভালো করেই জানেন। সিনেমা বা নাটকে রাতের দৃশ্য ধারণ করতে তাঁরা এই জ্ঞানটুকু কাজে লাগান। চাঁদের পৃষ্ঠে আসলে সূক্ষ্ম গুঁড়া ও ধুলাবালু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তবু সেখান থেকে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়। অনেকটা আয়নার মতো। তবে সে আয়না চকচকে নয়, ঝাপসা। তাই ঠিকমতো আলো প্রতিফলিত করতে পারে না। চাঁদের উজ্জ্বলতা সূর্যের চেয়ে প্রায় সাড়ে চার লাখ ভাগ কম। সিনেমার ফটোগ্রাফাররা তাই প্রায়ই সূর্যের আলোয় কোনো দৃশ্যের শুটিং করেন। এরপর উষ্ণ রংগুলো ব্লক করতে ফিল্টার ব্যবহার করেন। আলো আরও কমাতে বা অনুজ্জ্বল করতে লেন্সের ফোকাল লেন্থেও কারসাজি করেন। ব্যস, কেল্লা ফতে! এভাবেই তৈরি হয় চাঁদের আলোর জোছনার বিভ্রম। কিন্তু চাঁদের আলোর আসল রং ফিরোজা কেন?

আগেই বলেছি, চোখের রেটিনায় দুই ধরনের কোষ থাকে—রড ও কোন কোষ। দিনের আলোয় কোন কোষ সক্রিয় থাকায় সব রঙের আলো অনুভব করা যায়। বিশেষ করে হলদে সবুজের প্রতি রেটিনার সংবেদনশীলতা থাকে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু কম আলোয় অনুভব বদলে যায় নীলচে আলোতে। রেটিনার সংবেদনশীলতা বেড়ে যায় নীলচে-সবুজের প্রতি। আর আলোর বর্ণালি রেখার অন্য প্রান্তের লাল ও বেগুনির প্রতি সংবেদনশীলতা ছট করে নেই হয়ে যায়। এ রংগুলো তখন চোখে ধরা পড়ে ধূসর রঙে। তাই চাঁদের আলো দেখতে অমন ফিরোজা লাগে।

কম আলোয় চোখের সংবেদনশীলতার এই পরিবর্তনকে বলা হয় পারকিনজে শিফট। পোলিশ বিজ্ঞানী জ্যান পারকিনজে প্রথম ব্যাপারটা খেয়াল করেন। তাই তাঁর নামেই এর নামকরণ করা হয়। অপরাধ তদন্তে যে হাতের ছাপ ব্যবহার করা যায়, সে কথাও প্রথম বলেন তিনি। যা-ই হোক, রেটিনার কোণ আকৃতির কোন কোষগুলো কাজ করে কালার রিসেপ্টর হিসেবে। দিনের আলো যথেষ্ট ম্লান হয়ে গেলে আমরা প্রকৃতির সবুজ রং অনুভব করতে পারলেও কমলা ও লাল অনুভব করতে পারি না। এ কারণে আধুনিক শহরগুলোতে এখন ফায়ার সার্ভিসের আগুন নেভানোর গাড়িগুলো রাঙানো হয় লাল নয়, সবুজ রঙে। কারণ, রাতের বেলা প্রচলিত লাল রং আমরা ভালো করে বুঝতে পারি না। একই কারণে যুক্তরাষ্ট্রের হাইওয়ের সাইনগুলোর জন্যও এখন বেছে নেওয়া হচ্ছে সবুজ রং।

সূর্যের আলো ও রঙের এই অদ্ভুত ব্যাপার-স্যাপারের আসলে শেষ নেই। সেগুলো বলা যাবে আরেক দিন।

লেখক : নির্বাহী সম্পাদক, বিজ্ঞানচিন্তা

সূত্র : *দ্য সান'স হার্টবিট/* বব বারম্যান; *দ্য বডি/* বিল ব্রাইসন; *দেখা আলো, না দেখা রূপ/* মুহম্মদ জাফর ইকবাল; সায়েন্টিফিক আমেরিকান
নাসা ভট জিওডি; উইকিপিডিয়া

রাসায়নিক গঠন : পর্ব ২

জৈব যৌগের গঠন

রউফুল আলম

গত সংখ্যায়* আমরা শুধু একক বন্ধনযুক্ত যৌগ বা সিঙ্গেল বন্ডেড কম্পাউন্ড নিয়ে আলোচনা করেছি। এই পর্বে বহুবন্ধনযুক্ত যৌগ বা মাল্টিপল বন্ডেড কম্পাউন্ড এবং কার্যকরী মূলক বা ফাংশনাল গ্রুপসহ অণু গঠনের অঙ্কন নিয়ে আলোচনা করব।

বহুবন্ধনযুক্ত যৌগ

জৈব যৌগে যদি শুধু কার্বন-কার্বন একক বন্ধন (C-C bond) থাকে, তাহলে সেগুলোকে বলা হয় সম্পৃক্ত যৌগ বা স্যাচুরেটেড কম্পাউন্ড। আর যদি একক বন্ধন ছাড়াও কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন (C=C bond) বা ত্রিবন্ধন থাকে, তাহলে সেসব যৌগকে বলা হয় অসম্পৃক্ত যৌগ বা আনস্যাচুরেটেড কম্পাউন্ড। একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, কোনো যৌগে যদি কার্বন-অক্সিজেন দ্বিবন্ধন থাকে বা কার্বন-নাইট্রোজেন দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকে, তাহলে সেগুলোকে অসম্পৃক্ত যৌগ বলা যাবে না। সম্পৃক্ত বা অসম্পৃক্ত বিষয়টা নির্ভর করে শুধু কার্বন-কার্বন বন্ধনের ওপর।

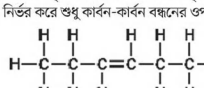

ছবি ১ : প্রচলিত অঙ্কনে অণুর সমাণুতাকে প্রকাশ করা সহজ নয় এবং অঙ্কনে অনেক সময় ব্যয় হয়।

কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধনযুক্ত যৌগের নামের শেষে ইন (ene) এবং ত্রিবন্ধনযুক্ত যৌগের নামের শেষে আইন (yne) যুক্ত করে নামকরণ করা হয়। ফলে যৌগের ধরন সহজেই বুঝতে সুবিধা হয়। দ্বিবন্ধনযুক্ত যৌগকে সাধারণভাবে বলা হয় অ্যালকিন যৌগ।

হেক্সিন (Hexene) যৌগের উদাহরণ লক্ষ করা যাক। হেক্সিন যৌগে ছয়টি কার্বন পরমাণু আছে, তাই হেক্স (Hex), আর দ্বিবন্ধন থাকায় শব্দের শেষে ইন (ene) যুক্ত করে হেক্সিন নাম দেওয়া হয়েছে। যদিও যৌগটিকে ৩-হেক্সিন বললেই সবচেয়ে সঠিক হয়। নিচে সেটা আলোচনা করা হয়েছে।

হেক্সিন যৌগকে আমরা যদি ছবি ১-এর মতো আঁকি, তাহলে অনেক সময় প্রয়োজন। এ ছাড়া যৌগে যদি দ্বিবন্ধন থাকে, তাহলে দুটি আইসোমার বা সমাণু থাকে। একটা হলো ট্রান্স-আইসোমার, অন্যটা সিস-আইসোমার। ট্রান্স ও সিস-আইসোমারকে জ্যামিতিক সমাণুতা বা জিওম্যাট্রিক আইসোমারিজম বলা হয়। পুরোনো নিয়মে অণু বা যৌগের এই সমাণুতা আঁকতে গেলেও পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করা যায় না। অন্যদিকে যদি নিচের চিত্রের (ছবি ২) মতো আধুনিক নিয়মে আঁকা হয়, তাহলে বোধগম্য হয় সহজে। এ ছাড়া সারা পৃথিবীতে এখন অর্গানিক কেমিস্ট বা জৈব রসায়নবিদেরা এভাবেই আঁকেন। ফলে যত নামকরা জার্নাল বা বিখ্যাত বই আছে, সর্বত্র এই আধুনিক নিয়মের অঙ্কন অনুসরণ করা হয়।

ট্রান্স-আইসোমার হলো যখন দ্বিবন্ধনের সবচেয়ে কাছের কার্বন পরমাণু দুটি (গোলাপি রঙের বল দিয়ে চিহ্নিত) একে

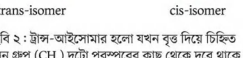

ছবি ২ : ট্রান্স-আইসোমার হলো যখন বৃত্ত দিয়ে চিহ্নিত মেথিলিন গ্রুপ (CH_2) দুটো পরস্পরের কাছ থেকে দূরে থাকে। আর সিস-আইসোমার হলো যখন বৃত্ত দিয়ে চিহ্নিত মেথিলিন গ্রুপ (CH_2) দুটো পরস্পরের কাছাকাছি থাকে।

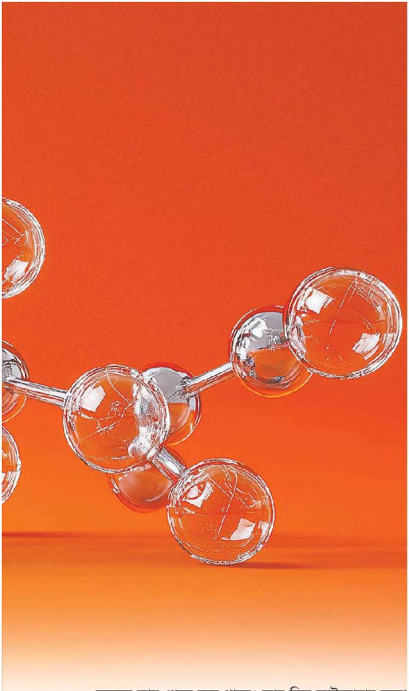

অন্যের কাছ থেকে দূরে থাকে। আর সিস আইসোমার হলো যখন সেই দুটি কার্বন পরমাণু একে অন্যের কাছাকাছি সরে আসে। একটু প্র্যাকটিস করলেই দ্রুত এই আইসোমারগুলো আঁকা যাবে।

মনে রাখতে হবে, জ্যামিতিক সমাণুতা আর কাইরালিটি বা আলোক সমাণুতা কিন্তু এক নয়। অনেকেই বিষয়টিকে এক করে ফেলে। জ্যামিতিক সমাণুতায় প্রতিসাম্যতার কোনো প্রশ্ন নেই। আলোক সমাণুতার জন্য যৌগকে অবশ্যই অপ্রতিসম হতে হবে। এ বিষয়গুলো পরবর্তী সময়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

যৌগে দ্বিবন্ধন থাকলে এর অবস্থান নির্ণয় করতে হয়। অবস্থান নির্ণয় করতে কার্বন পরমাণু গণনা করে সংখ্যা দিয়ে দ্বিবন্ধনের অবস্থান নির্ণয় করা হয়। যৌগের যে প্রান্ত থেকে গণনা করলে দ্বিবন্ধনকে কম সংখ্যায় চিহ্নিত করা যায়, সে প্রান্ত থেকেই গণনা করা হয়। যেমন নিচের চিত্রে দুটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো হয়েছে (ছবি ৩)।

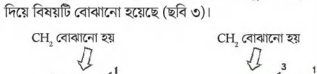

ছবি ৩ : ১-হেক্সিন ও ৩-হেক্সিন

ওপরের উদাহরণগুলো ছিল অচক্রীয় (অ্যাসাইক্লিক) বা সরলরৈখিক যৌগের। চক্রীয় যৌগে বা সাইক্লিক কম্পাউন্ডেও দ্বিবন্ধন থাকতে পারে। যেমন সাইক্লোহেক্সিন (ছবি ৪)।

ছবি ৪ : সাইক্লোহেক্সিন

কার্বন-কার্বন ত্রিবন্ধনযুক্ত যৌগও প্রকৃতিতে আছে। এসব যৌগকে সাধারণভাবে বলা হয় অ্যালকাইন (ছবি ৫)। এ ধরনের যৌগে সিস ও ট্রান্স-আইসোমার থাকে না। অ্যালকাইন যৌগে এক বা একাধিক কার্বন থাকে, যার সঙ্গে কোনো হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত থাকে না।

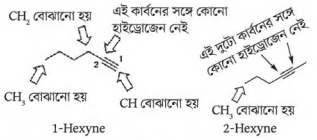

ছবি ৫ : ১-হেক্সাইন ও ২-হেক্সাইন, অ্যালকাইনের উদাহরণ

অ্যালকাইন যৌগ চক্রিক বা সাইক্লিক হতে পারে। যেমন সাইক্লোঅক্টাইন একটা জনপ্রিয় উদাহরণ (ছবি ৬)। এই যৌগে আটটি কার্বন পরমাণু আছে।

এ ধরনের যৌগ রাসায়নিকভাবে খুবই সক্রিয় হয়, অর্থাৎ সহজেই বিক্রিয়া করে। ফলে এদের স্থিতিশীলতা বা স্ট্যাবিলিটি কম। কোনো যৌগ যদি রাসায়নিকভাবে খুবই সক্রিয় হয়, তাহলে সেসব যৌগ পৃথককরণ বা বিশুদ্ধকরণ বেশ কঠিন। অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

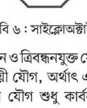

ছবি ৬ : সাইক্লোঅক্টাইন

যতগুলো দ্বিবন্ধন ও ত্রিবন্ধনযুক্ত যৌগের উদাহরণ দিয়েছি, সব কটিই বেশ উদ্বায়ী যৌগ, অর্থাৎ এদের স্ফুটনাঙ্ক কম। এর কারণ হলো, যেসব যৌগ শুধু কার্বন ও হাইড্রোজেন দিয়ে গঠিত, সেসব যৌগ আকারে অনেক বড় না হলে, আণবিক ভর অনেক বেশি না হলে সাধারণত বেশ উদ্বায়ী হয়। কারণ, অণুগুলোতে আন্তঃআণবিক বল দুর্বল থাকে। হাইড্রোজেন বন্ধন আন্ত-আণবিক বল বৃদ্ধি করে। আর হাইড্রোজেন বন্ধনের জন্য কার্বন-হাইড্রোজেন ছাড়া অন্যান্য পরমাণুও থাকতে হয়।

জৈব যৌগের অণুতে প্রধানত কার্বন ও হাইড্রোজেন পরমাণু থাকলেও অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও সালফার পরমাণুও দেখায় যায়। অর্গানিক কেমিস্টরা তাই এসব পরমাণুকে হেটারো অ্যাটম বলে থাকেন। যদিও হেটারো অ্যাটম বলতে প্রধানত নাইট্রোজেনকেই বোঝানো হয়।

জৈব যৌগে অক্সিজেন কয়েকটা কার্যকরী মূলক হিসেবে থাকতে পারে। যেমন অ্যালকোহল, ইথার, অ্যালডিহাইড, কিটোন ইত্যাদি। অ্যালডিহাইড ও কিটোনকে আলাদা করে কার্বনিল মূলকও বলা হয়ে থাকে। কার্বনিল মূলক হলো কার্বন ও অক্সিজেনের দ্বিবন্ধন।

জৈব যৌগে হাইড্রক্সি (OH) মূলক থাকলে সেগুলোকে সাধারণভাবে অ্যালকোহল বলা হয়। এদের নামের শেষে অল (ol) যুক্ত করা হয়। যেমন ম্যাথানল বা মিথানল, ইথানল, আইসোপ্রোপানল এবং টারসিয়ারি-বিউটানল বা টার-বিউটানল ইত্যাদি। এই অ্যালকোহলগুলোর আণবিক ভর কম। এদের প্রচুর ব্যবহার আছে। যেমন দ্রাবক হিসেবে এসব যৌগের ব্যবহার সারা পৃথিবীব্যাপী। ইথানলকে যানবাহনের জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। পানীয় হিসেবে ইথানল ব্যবহৃত হয়। আইসোপ্রোপানল বা আইপিএ দ্রাবক হিসেবে খুব জনপ্রিয়। পৃথিবীতে বর্তমানে গড়ে ২০-২৫ লাখ মেট্রিক টন আইপিএ উৎপাদন করা হয়। হ্যান্ড স্যানিটাইজারে আইপিএ ব্যবহার করা হয়।

CH_3-OH or, MeOH

মিথানল

C_2H_5-OH or, EtOH

ইথানল

or, ^{i}PrOH or IPA

আইসোপ্রোপানল

ছবি ৭ : মিথানল, ইথানল এবং আইসোপ্রোপানল

অধিক কার্বন পরমাণুর অ্যালকোহল যৌগেরও ব্যবহার কম নয়। বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য এসব যৌগ ব্যবহৃত হয়। রসায়নের বহু ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী মূলককে অন্য কার্যকরী মূলকে রূপান্তরিত করার প্রয়োজন হয়। এটা খুব প্রচলিত একটা পদ্ধতি বা বিক্রিয়া। এটাকে বলা হয় Functional Group Interconversion (FGI)। ওষুধ ও রাসায়নিক শিল্পে এবং পারফিউম তৈরিতে এ ধরনের পদ্ধতি বা বিক্রিয়া প্রয়োগ করতে হয়।

নিচের যৌগটিতে (ছবি ৮) ছয়টি কার্বন পরমাণু আছে। তাই এর নাম হেক্সানল। হেক্সেইন থেকে হেক্সানল।

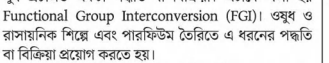

ছবি ৮ : হেক্সানল

২-হেক্সানল (2-Hexanol) যৌগটি আঁকার জন্য ওপরের কোনো পদ্ধতি আমরা ব্যবহার করব না। বরং আধুনিক অঙ্কন ব্যবহার করব (ছবি ৯)।

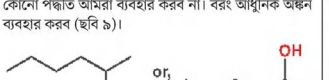

ছবি ৯ : হেক্সানলের আধুনিক অঙ্কন

এ ধরনের অ্যালকোহলকে শাখাযুক্ত বা ব্রাঞ্চড (Branched or Internal) অ্যালকোহলও বলা হয়। যেহেতু অ্যালকোহল গ্রুপটি যৌগের প্রান্তীয় কোনো কার্বন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত নয়। পক্ষান্তরে নিচের যৌগটি হলো ১-হেক্সানল (ছবি ১০)। এই যৌগে অ্যালকোহল গ্রুপ প্রান্তিক কার্বনের সঙ্গে যুক্ত। তাই এ ধরনের যৌগকে সরলরৈখিক বা প্রান্তিক (Terminal or Linear) অ্যালকোহলও বলা হয়।

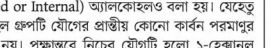

ছবি ১০ : ১-হেক্সানল

তাহলে ১-হেক্সানল হলো লিনিয়ার অ্যালকোহল এবং ২-হেক্সানল হলো ব্রাঞ্চড অ্যালকোহল। তোমরা যদি লক্ষ করো, তাহলে দেখবে, এই দুটি যৌগের আণবিক ভর কিন্তু একই। কিন্তু এরা ভিন্ন রাসায়নিক যৌগ। কারণ, এদের কার্যকরী মূলক, অ্যালকোহল গ্রুপ ভিন্ন ভিন্ন কার্বন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত। তাই তারা একে অন্যের সমাণু বা আইসোমার। এ ধরনের আইসোমারকে বলা হয় রিজিও-আইসোমার (Regioisomer)। চাইলে স্থানিক সমাণুও বলা যায়। রসায়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা। রিজিও-আইসোমারগুলো ভিন্ন ভিন্ন যৌগ। তাদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম আলাদা।

একইভাবে অন্যান্য কার্যকরী মূলকগুলো বসিয়ে ভিন্ন ভিন্ন যৌগ আঁকা যায়। যেমন অ্যালকোহলের জায়গায় আমরা হ্যালোজেন (F, Cl, Br, I) পরমাণু ব্যবহার করতে পারি। যেমন ১-হেক্সানলের মতো করে আঁকা যায় ১-ব্রোমোহেক্সেইন। অ্যালকোহলের স্থলে ব্রোমিন পরমাণু বসিয়ে দিলাম। একটা ভিন্ন যৌগ হয়ে গেল।

ছবি ১১ : ১-ব্রোমোহেক্সেইন

অ্যালকোহলের মতোই এই যৌগও লিনিয়ার বা ব্রাঞ্চড হতে পারে। ব্রোমিন পরমাণু কোন কার্বনের সঙ্গে যুক্ত, সেটার ওপর নির্ভর করবে।

এসব যৌগ চক্রীয়ও হতে পারে। যেমন ব্রোমো-সাইক্লোহেক্সেইন। আগের পর্বে সাইক্লোহেক্সেইনের একটা স্থিতিশীল কনফরমেশন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। চেয়ার কনফরমেশন।

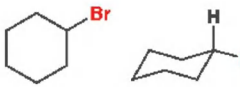

ছবি ১২ : ব্রোমো-সাইক্লোহেক্সেইন

ওপরের দুটি যৌগ কিন্তু একই যৌগ। শুধু ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। চেয়ার কনফরমেশন দিয়ে এঁকে দেখানোর কারণ হলো, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। তোমরা যেন যেকোনো সাইক্লোহেক্সেন যৌগ এভাবে আঁকার চর্চা করো। এর বিশেষ গুরুত্ব আছে। এ নিয়ে পরবর্তী পর্বগুলোতে বিস্তর আলোচনা হবে।

রাসায়নিক গঠনের আধুনিক অঙ্কন আমরা শিখে গেলে অনেক কিছু বুঝতে ও বোঝাতে সহজ হবে। রাসায়নিক বিক্রিয়া বুঝতেও অনেক সহজ হবে। বাংলাদেশের বেশির ভাগ শিক্ষার্থী রাসায়নিক বিক্রিয়া বোঝে না বা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়, তার একটা কারণ কিন্তু রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে ভালোভাবে না জানা। পরবর্তী পর্বে আরও কিছু চমৎকার বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।

লেখক : গবেষক ও লেখক

* আগের পর্ব পড়তে এই কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

প্রকৃতির গোপন সুরে হারাতে চাইলে

রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ। বাংলার প্রকৃতি দেখে মুগ্ধ কবির ভাষ্যে বারবার উঠে এসেছে গঙ্গাফড়িং, কাচপোকা প্রজাপতি, শরতের রোদের বিলাস, হিজলের ক্লান্ত পাতাসহ সবুজের মনকাড়া সৌন্দর্যের কথা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, মানুষের চোখ আসলে এখনো অভ্যস্ত হয়নি ইট-পাথরের সঙ্গে। তাই মাঝেমধ্যে সবুজে চোখ রাখলে আমাদের শান্তি লাগে, মন প্রফুল্ল হয়।

প্রকৃতির এই মুগ্ধকর সৌন্দর্যের কথা ঢালাওভাবে শুধু তথ্যের ভিড়ে, গন্ডীর ভাষ্যে নিবদ্ধ আকারে যদি উঠে আসে, তবে তাতে হারিয়ে যাওয়ার বাসনা, মিশে যাওয়ার ইচ্ছা জাগবে কী করে! কবিতার মতো সুন্দর গদ্যে, গল্পের ছলে কেউ যদি নিয়ে যায় শব্দরথে প্রকৃতির গহিনে, তাহলে মস্তিষ্ক নামের বাহনটি আপনাতেই ফুটিয়ে তোলে সবুজ-সুন্দর; হারিয়ে যেতে ইচ্ছা করে রবীন্দ্রনাথের 'পাগলা হাওয়ার' তালে; বৃষ্টি, সবুজ আর সুন্দরের গভীরে। ঠিক এভাবেই প্রকৃতির পরিচয় নিয়ে মানুষ বা বিজ্ঞানের সীমা ছাড়িয়ে শুধু একরাশ মুগ্ধতার বৃষ্টির পশলায় যেন আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যান দ্বিজেন শর্মা। তাঁর একেকটি বই যেন প্রকৃতির আত্মকথা—যেন গল্প, কিংবা বলা ভালো, কবিতা—অথচ সেই কবিতার ভেতরে-ভেতরে তিনি মেলে ধরেছেন এর প্রয়োজনীয়তা, ফুটিয়ে তুলেছেন একজন বিজ্ঞানীর ভাবনা। সেই ভাবনার শিকলবন্দী *গহন কোন বনের ধারে : প্রকৃতি ও পরিবেশের কথা*।

ছোট্ট, মাত্র ১৪৪ পৃষ্ঠার বইটিতে তিনটি লেখা—'সুদূর কোন নদীর পারে', 'গহন কোন বনের ধারে' ও 'আদিসখা চিরসখা'। লেখা, কিংবা গল্পও কি বলা যায়? লেখক তখন হাঁটছেন নদীর ধারে, প্রকৃতির সবুজের মধ্যে, পাখি দেখার ইচ্ছা তাঁর; 'পাখি দেখা' আবার কী—এমনই বাক্যবাণ এড়াতে তিনি বলেন, ঔষধি গাছ খুঁজছেন। এমনই সময় দেখা তাঁর 'তজব তরফদার' নামের এক আজব লোকের সঙ্গে। সেই মানুষ তাঁকে বলে যায়, পাখি শিকার করা উচিত নয় কেন;

গহন কোন বনের ধারে

দ্বিজেন শর্মা

প্রকাশক : সাহিত্য প্রকাশ
প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৪
তৃতীয় সংস্করণ : ২০১৮
প্রচ্ছদ : অশোক কর্মকার
পৃষ্ঠা : ১৪৪
দাম : ৩৫০ টাকা

অথচ সেই নির্জনের তারা হঠাৎ চমকে যায় গুলির শব্দে, একদল শিকারি কোথাও লুকিয়ে গুলি করছে। চোখের সামনে বিলে পাখির মৃত্যু দেখে তারা, আর তজব তরফদার নামের মানুষটি হারিয়ে যায়, রেখে যায় একটি খাতা। সেই খাতায় রয়েছে ভিন্ন কোনো জগতের গল্প, আছে উদ্ভিদবিদ্যার খেরোখাতা, বরফ গলে যাওয়ার পরিণতি ও পৃথিবীকে বাঁচাতে মানুষের করণীয়র কথা। পরের লেখাটিতে গহন এক বনে লেখক নিয়ে যান, যেখানে মহানাগশঙ্খচূড় সাপ থাকে, বনের সীমানা ছাড়িয়ে চলে আসে শিকারি বাঘ—কেন সে বন ছেড়ে অমন হামলা করে লোকালয়ে? কী তার পরিণতি?

শেষের 'আদিসখা চিরসখা' লেখাটিতে প্রভুভক্ত কুকুরের কথা লিখেছেন লেখক, এই প্রাণীর প্রাণের ভেতরের কথা, কালে কালে তার বদলে যাওয়া, বন্য প্রাণী থেকে ধীরে ধীরে মানুষের সহচরে পরিণত হওয়ার এ এক অন্য রকম গল্প।

এসব গল্পের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে আছে কবিতার মতো মমত্ব, আছে প্রকৃতির গহিনের কোমল বিষাদমাখা সুর, যে সুর সম্ভবত খাঁটি প্রকৃতিপ্রেমীরাই শুনতে পান। সেই লুকানো সুর তুলে ধরে লেখক আমাদের প্রকৃতির গোপন, নিঃসঙ্গ, সুন্দর রূপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর ভাষার মমত্ব শহরের ইট-পাথরের যান্ত্রিক জীবন থেকে এক টানে বের করে নিয়ে যায় প্রকৃতির বুকে, গহন কোনো বনের ধারে। সাহিত্য প্রকাশ থেকে প্রকাশিত বইটি পাঠক পাবেন অনলাইন ও অফলাইনের বিভিন্ন বইয়ের দোকানে।

নতুন বই

গ্রন্থনা : মুনিয়া মানতাসা

জিরো : দ্য বায়োগ্রাফি অব আ ডেঞ্জারাস আইডিয়া

চার্লস সিফ
অনুবাদ : আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ
প্রকাশক : প্রথমা
পৃষ্ঠা : ২০০
দাম : ৪২৫ টাকা

শূন্যের রহস্য, ইতিহাস, মহাবিশ্বের জন্ম-মৃত্যুতে এর ভূমিকাসহ আরও অনেক কিছু।

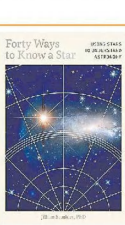

ফোর্টি ওয়েজ টু নো আ স্টার

জিলিয়ান স্কাডার
প্রকাশক : প্রিন্সটন আর্কিটেকচারাল প্রেস
পৃষ্ঠা : ১৯২
দাম : ২০.৫ পাউন্ড

ছবি ও গল্পে সহজ ভাষায় নক্ষত্রদের রোমাঞ্চকর গল্প। ৪০টি ছোট নিবন্ধে নক্ষত্রের জন্ম-মৃত্যু, জীবনেতিহাস, বিবর্তন উঠে এসেছে এতে।

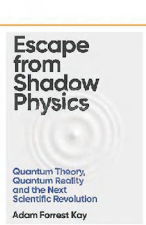

এস্কেপ ফ্রম শ্যাডো ফিজিকস

অ্যাডাম ফরেস্ট কে
প্রকাশক : ডব্লিউঅ্যান্ডএন
পৃষ্ঠা : ৪৯৬
দাম : ১৩ ডলার

কোয়ান্টাম তত্ত্ব, এ তত্ত্বের আলোকে বাস্তবতার স্বরূপ এবং ভবিষ্যতের রূপরেখা—তাত্ত্বিক পদার্থবিদের ভাষ্যে। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যায় আগ্রহীদের মন জোগাবে।

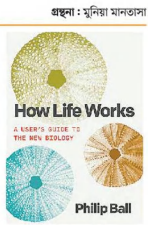

হাউ লাইফ ওয়ার্কস

ফিলিপ বল
প্রকাশক : পিকাডোর
পৃষ্ঠা : ৫৬০
দাম : ১৬.৯ ডলার

আমরা এখন জিন সম্পাদনা করতে পারি, বদলে দিতে পারি কোষের রূপ। নতুন যুগের আধুনিক জীববিজ্ঞানের জগৎটি এ বইয়ে মেলে ধরা হয়েছে পাঠকের সামনে।

পুঞ্জাক্ষি

মাকড়সা বা শামুকের মতো বিভিন্ন প্রাণী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীদের চোখে মাত্র একটি লেন্স থাকে। একক ও বড় আকারের এ চোখে বেশিসংখ্যক আলোকসংবেদী কোষ থাকে, তাই অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সহ স্পষ্ট ছবি তৈরি হয়। পোকামাকড়ের চোখ খানিকটা ভিন্ন ধরনের। এগুলোকে বলে পুঞ্জাক্ষি (যৌগিক চোখ)। এতে অনেকগুলো লেন্স থাকে। লেন্সগুলোর আলো অল্প কিছু কোষের ওপর ফোকাস হয়। প্রতিটি লেন্স খুব ছোট হওয়ায় রেজল্যুশন ভালো হয় না। এমনকি ড্রাগনফ্লাইয়ের সেরা চোখও মানুষের চোখের চেয়ে অনেক অনেক কম স্পষ্ট দেখতে পায়। তবে পুঞ্জাক্ষিজুড়ে ছড়ানো শত শত লেন্স চারপাশের অনেকটা জায়গা দেখতে সাহায্য করে। ইংরেজিতে বলা হয় 'ওয়াইড ফিল্ড অব ভিউ'। এর মধ্যে সামান্য নড়াচড়াও ধরা পড়ে এদের লেন্সে, ফলে একের পর এক লেন্স সক্রিয় হয়ে ওঠে ধারাবাহিকভাবে। এ জন্য পোকার চোখকে বলা যায় অতি সংবেদনশীল মোশন ডিটেক্টর।

আলো-ছায়ার মধ্যে চলাচলের সময় এসব রঞ্জকপূর্ণ অঞ্চল সূর্যের আলোয় বাসকারী পতঙ্গদের দেখতে সাহায্য করে।

অ্যানটেনার সংবেদী কোষ বায়ুর চলাচল শনাক্ত করে। দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে এ তথ্য মিলিয়ে পতঙ্গ নিয়ন্ত্রিতভাবে উড়তে পারে।

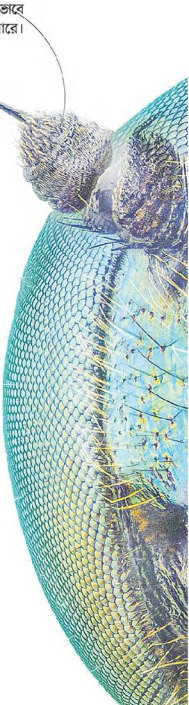

রঙিন চোখ

কালো সৈনিক মাছির (Hermetia illucens) চোখের বেগুনি ডোরাকাটা দাগের জন্য যেসব রঞ্জক পদার্থ দায়ী, সেগুলো চোখের বিভিন্ন অংশকে সুরক্ষা দেয়।

আলো-অন্ধকারে মানিয়ে নেওয়া

সবচেয়ে শক্তিশালী পুঞ্জাক্ষিতে থাকে ফ্যাসেটস বা ওমাটিডিয়া, যা রঞ্জকের পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে। পাশের ফ্যাসেটকে প্রভাবিত না করেই স্নায়ুকোষে এরা আলো পৌঁছে দেয়। উজ্জ্বল আলোয় এই চোখ সবচেয়ে ভালো কাজ করে। সন্ধ্যায় বা রাতে ওড়া পোকামাকড়ের কম রঞ্জকযুক্ত ফ্যাসেটস থাকে। এর কারণ, যেন প্রতিটি সংবেদনশীল কোষ একাধিক ফ্যাসেটস থেকে আলো গ্রহণ করে সুবিধা পায়। এটি কম আলোয় সবচেয়ে ভালো কাজ করে, তবে এতে কম দেখা যায়।

আলো একত্রীকরণ

পুঞ্জাক্ষির প্রতিটি লেন্স একটি ফ্যাসেট বা ওমাটিডিয়ামের অংশ। এতে আলোকসংবেদী কোষ থাকে। মাছিদের চোখে, যেমন এই জেম সোলজার মাছির (Microchrysa sp.) সংলগ্ন ফ্যাসেটগুলো একসঙ্গে আলো সংগ্রহের কাজ করে। ফলে কম আলোতেও চোখ হয়ে ওঠে অতি সংবেদী।

ষড়ভুজাকার লেন্সগুলোর পৃষ্ঠে থাকে স্বচ্ছ কিউটিকল, আর নিচে থাকে কেলাসযুক্ত কোন কোষ।

চোখের ওপরের পৃষ্ঠের লেন্সগুলো হয় বড় আকারের। এগুলো ওপর থেকে আসা আলো সংগ্রহ করে ভালোভাবে ফোকাস করতে সাহায্য করে।

পেছনমুখী ফ্যাসেটগুলো কীটপতঙ্গকে চারপাশ দেখতে সাহায্য করে।

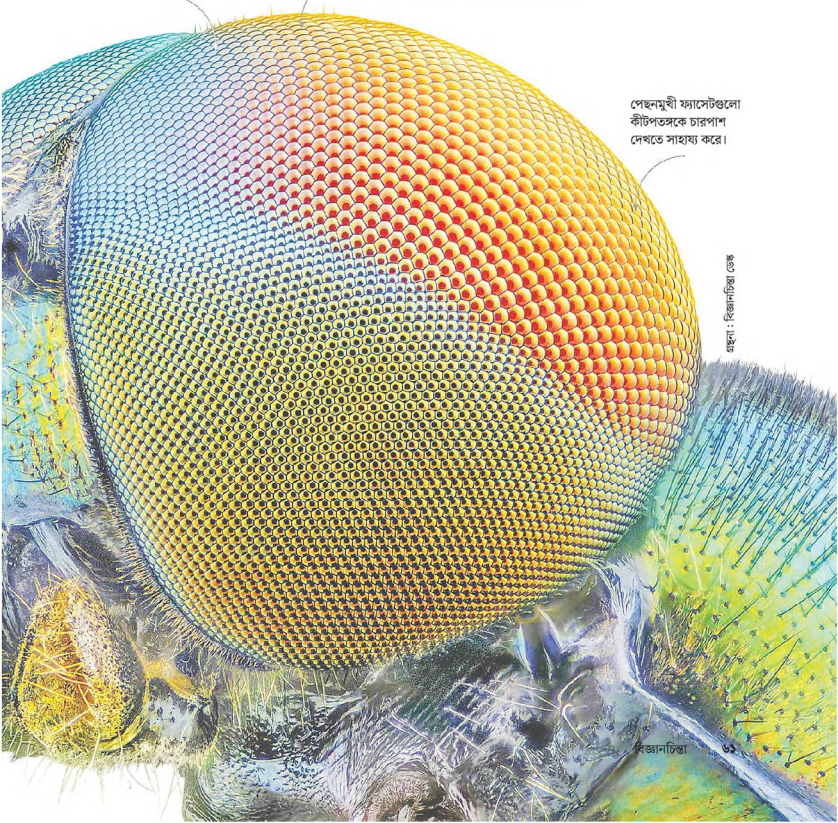

গ্রন্থনা : বিজ্ঞানচিন্তা ডেস্ক

প্লাস্টিকের রকমফের

আব্দুল্লাহ আল মাকসুদ

চার পা শে তাকিয়ে দেখুন তো, প্লাস্টিকের কত জিনিস চোখে পড়ছে! যেখানেই থাকুন না কেন, এই লেখা যে ডিভাইসে, অর্থাৎ স্মার্টফোন বা কম্পিউটারে পড়ছেন, সেগুলোর কাঠামো বা কোনো অংশও প্লাস্টিক বা এ-জাতীয় উপাদানেই তৈরি। আমাদের চারপাশে তো বটেই, মহাসাগর, বনাঞ্চল, মরুভূমি বা মেরু অঞ্চল—এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে প্লাস্টিকের উপস্থিতি নেই।

প্লাস্টিক আবিষ্কারের একক কৃতিত্ব কাউকে সেভাবে দেওয়া যায় না। ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বিজ্ঞানীরা শিল্পবিপ্লবের ফলে উৎপাদিত নানা পণ্য মোড়কজাত করার উপযোগী উপাদান আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। প্রাকৃতিকভাবে অনেকে প্লাস্টিকের মতো উপাদান তৈরিও করেছিলেন। যুক্তরাজ্যের সায়েন্স মিউজিয়াম বলছে, প্রথম সিন্থেটিক বা কৃত্রিম প্লাস্টিক উদ্ভাবন করেন বেলজিয়ামের রসায়নবিদ ও মার্কেটিয়ার লিও বেকল্যান্ড। ১৯০৭ সালের ঘটনা সেটি।

এরপরই মূলত প্লাস্টিকের জয়জয়কার ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীজুড়ে। কাচের মতো স্বচ্ছ, কিন্তু ভাঙে না। কাগজের মতো পাতলা হতে পারে, কিন্তু সহজে ছিঁড়ে যায় না। কাপড়ের মতো নমনীয়, কিন্তু পানিতে ভেজে না। এমন এক পণ্যের প্রতি মানুষের প্রবল আগ্রহ কাজ করবে, সেটাই স্বাভাবিক। বিপত্তিটা টের পাওয়া যায় বেশ কিছুকাল পর। দারুণ এ উপাদান কোনোভাবেই পচে না। পানি, মাটি—কোনো কিছুই একে পুরোপুরি ক্ষয় করতে পারে না। বছরের পর বছর অবিকৃত অবস্থায় থাকে, একসময় সেটা অতিক্ষুদ্র প্লাস্টিক বা মাইক্রোপ্লাস্টিকে পরিণত হয়ে প্রাণীর দেহে পর্যন্ত ঢুকে পড়ে। মানবদেহেও মাইক্রোপ্লাস্টিকের সন্ধান মিলেছে সম্প্রতি।

যা-ই হোক, এত কিছুর পরও কিন্তু প্লাস্টিকের ব্যবহার কমেনি। বরং বেড়ে চলেছে বলা যায়। এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শুধু পণ্যের মোড়কে প্লাস্টিক সীমাবদ্ধ নেই। তৈজসপত্র থেকে শুরু করে ঘরের আসবাব, বিভিন্ন যন্ত্রের কাঠামো, এমনকি যানবাহন তৈরি করা হয় প্লাস্টিক দিয়ে।

এই বিভিন্ন ধরনের জিনিস যে তৈরি হচ্ছে, তার সব কি একই প্লাস্টিকের তৈরি? একদম না।

ব্যবহারের ধরনের ওপর ভিত্তি করে সাতটি ভাগে ভাগ করা হয় প্লাস্টিককে। প্রথম থেকে শুরু করা যাক।

রিসাইকেলিং কোড ১ : পলিইথিলিন টেরেফথালেট (পিইটি)

সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত প্লাস্টিকের মধ্যে এটি একটি। স্বচ্ছ, শক্তিশালী ও হালকা ধরনের এই প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয় মূলত খাবারের প্যাকেট, খাদ্য রাখার বক্স, কোমল পানীয়র বোতল, পলিয়েস্টার পোশাক বা দড়ি তৈরির কাজে।

রিসাইকেলিং কোড ২: উচ্চ ঘনত্বের পলিইথিলিন (এইচডিপিই)

সব ধরনের প্লাস্টিকের মধ্যে পৃথিবীজুড়ে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় উচ্চ ঘনত্বের পলিইথিলিন বা পলিথিন। এর আবার তিনটি ধরন আছে। উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন ঘনত্বের পলিইথিলিন। উচ্চ ঘনত্বের পলিইথিলিন শক্তিশালী, আর্দ্রতারোধী, রাসায়নিকভাবে প্রায় নিষ্ক্রিয়। বিভিন্ন রাসায়নিক, যেমন ডিটারজেন্টের বোতল, খেলনা, বেঞ্চ ও শক্ত পাইপ তৈরিতে কাজে লাগানো হয়।

রিসাইকেলিং কোড ৩ : পলিভিনাইল ক্লোরাইড (পিভিসি বা ভিনাইল)

পিভিসি প্লাস্টিকের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি দেখা যায় পাইপসহ ভবন নির্মাণের বিভিন্ন উপাদান তৈরিতে। শক্ত ধরনের এ প্লাস্টিক রাসায়নিকভাবে আরও বেশি নিষ্ক্রিয়। আবহাওয়াগত কারণে এদের তেমন ক্ষতি হয় না। নমনীয় না হওয়ায় এগুলো ভাঙা সম্ভব। একই সঙ্গে এগুলো মানবস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। সিসা, ডাই-অক্সিন, ভিনাইল ক্লোরাইডের মতো বিষাক্ত পদার্থ ছড়িয়ে পড়ে এগুলো থেকে।

রিসাইকেলিং কোড ৪ : কম ঘনত্বের পলিইথিলিন (এলডিপিই)

উচ্চ ঘনত্বের পলিইথিলিনের তুলনায় এটি বেশ হালকা, নরম ও নমনীয়। খাদ্য ও পানীয়র মোড়কের ভেতরে সাধারণত এ ধরনের প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া বাবল র‍্যাপ, বাজার করার পলিথিন ইত্যাদি তৈরি করা হয় এই পলিইথিলিন দিয়ে।

রিসাইকেলিং কোড ৫ : পলিপ্রোপাইলিন (পিপি)

সবচেয়ে টেকসই ধরনের প্লাস্টিকের মধ্যে এটি একটি। অন্য যেকোনো ধরনের প্লাস্টিকের চেয়ে বেশি তাপ সহ্য করতে পারে। ফলে গরম বা ঠান্ডা রাখতে হয়, এমন ধরনের মোড়ক তৈরির জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। তৈরি করা যায় স্ট্র, বোতলের ক্যাপ বা মুখ, গরম খাবার রাখার পাত্র, প্যাকেজিংয়ের ট্যাপ ইত্যাদি।

রিসাইকেলিং কোড ৬ : পলিস্টাইরিন (পিএস বা স্টাইরোফোম)

ওয়ান টাইম বা একবার ব্যবহারের উপযোগী খাবারের পাত্র তৈরি করা হয় পলিস্টাইরিন দিয়ে। এর আরেক নাম স্টাইরোফোম। সাদা রঙের ভঙ্গুর এ প্লাস্টিক পিভিসির মতোই বিপজ্জনক। এটি স্টাইরিন নামের ক্ষতিকর বিষাক্ত উপাদান নিঃসরণ করে। এই রাসায়নিক খাবারে মিশে গেলে তা সহজেই মানুষের পেটে চলে যায়। তবে খাবারের প্যাকেট ছাড়াও পণ্য প্যাকেজিংয়ের সময় ঝাঁকুনি থেকে সুরক্ষা দিতে এটি ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া শীতপ্রধান দেশে ঘরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে অনেক সময় এটি ভবন তৈরিতে কাজে লাগানো হয়।

রিসাইকেলিং কোড ৭ : অন্যান্য

ওপরের ছয়টি ভাগের কোনোটিতেই ফেলা যায় না, এমন সব প্লাস্টিককে রিসাইকেলিং কোড ৭ বা আদার (Other) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি একাধিক ধরনের প্লাস্টিকের সমন্বয়ে তৈরি। এ ধরনের প্লাস্টিক সাধারণত রিসাইকেল বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলা যায় না। চোখের চশমা, ইলেকট্রনিকস, সিডি বা ডিভিডি ইত্যাদি তৈরিতে এসব প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়।

আচ্ছা, প্লাস্টিকের রকমফের ও ব্যবহার তো জানা গেল। কিন্তু কীভাবে বুঝবেন, আপনার হাতে থাকা প্লাস্টিক কী ধরনের? একদম সহজ। প্লাস্টিকের পণ্যের নিচের অংশে তিন কোনা ক্ষেত্রের মধ্যে সংখ্যা লেখা থাকে। এই সংখ্যাই আসলে আমাদের রিসাইকেলিং কোড। এটা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন, প্লাস্টিকটি কী ধরনের। যেমন ১ লেখা থাকার অর্থ, বস্তুটি পলিইথিলিন টেরেফথালেট (পিইটি) ধরনের প্লাস্টিক।

আরেকটি বিষয়, যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা এফডিএ পিভিসি ছাড়া বাকি সব প্লাস্টিককে ফুড গ্রেড বা খাবার রাখার উপযোগী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে উচ্চ ঘনত্বের পলিইথিলিনকে খাদ্য সংরক্ষণের জন্য সবচেয়ে উপযোগী বলে বিবেচনা করা হয়।

লেখক : শিক্ষার্থী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সূত্র : প্লাস্টিক ওশানস ডট ওআরজি, উইকিপিডিয়া

ব্যায়াম বা ছোটাছুটি করলে গা থেকে গন্ধ আসে কেন

দুর্গন্ধ তৈরি হয় ব্যাকটেরিয়ার কারণে। ব্যাকটেরিয়া শরীরের ঘাম খায়। বয়সভেদে একজন মানুষের শরীরে ৪০ ট্রিলিয়নের বেশি ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে। শৈশবের পর মানুষের শরীরে ব্যাকটেরিয়া বাড়তে থাকে। বিশেষ করে বগল ও শরীর যেসব স্থান ভেজা থাকে, সেখানে ব্যাকটেরিয়া থাকে বেশি। সাবান দিয়ে গোসল করলে এসব ব্যাকটেরিয়া দূর হয়ে যায়। তাই ব্যায়াম বা খেলাধুলার পর শরীর ধুয়ে ফেলা বা ভালোভাবে গোসল করা উচিত।

ব্যাকটেরিয়া

ব্যাকটেরিয়া আণুবীক্ষণিক জীবন্ত জিনিস। প্রতিটি ব্যাকটেরিয়া একক কোষ দিয়ে গঠিত। কিছু ব্যাকটেরিয়া আমাদের জন্য ক্ষতিকর, তবে অনেক ব্যাকটেরিয়াই আমাদের উপকার করে। সুস্থ থাকার জন্যও দরকার ব্যাকটেরিয়া।

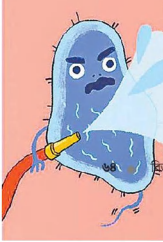

আঙ্ক আ সায়েন্টিস্ট অবলম্বনে কাজী আকাশ

খামার রহস্য

কাজী আকাশ

আইনস্টাইনের ধাঁধা বা আইনস্টাইনস রিডল। বলা হয়, মাত্র ২ শতাংশ মানুষ এ ধরনের ধাঁধার উত্তর দিতে পারেন। বাকি ৯৮ শতাংশই ভুল করেন। আপনি কোন দলে? ভালো কথা, মাথা খাটিয়ে সমাধান করতে পারলে রয়েছে বিশেষ পুরস্কার! তাহলে হয়ে যাক!

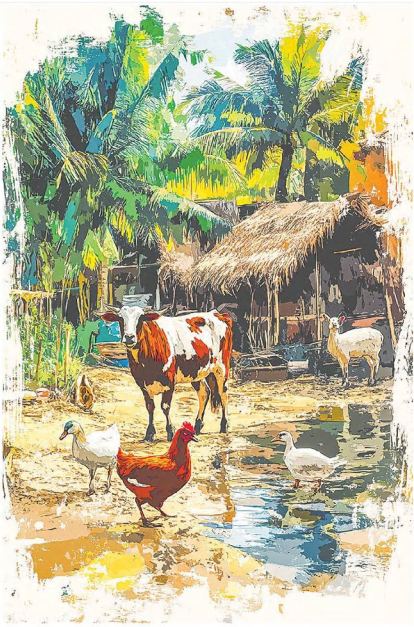

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটা গ্রামের নাম শালুকডাঙ্গা। সেখানকার বেশির ভাগ মানুষই গরিব। দিন আনে দিন খায়। আশপাশে প্রচুর জমি পড়ে আছে, কিন্তু চাষ করার মতো পর্যাপ্ত অর্থ নেই। তারপরও কৃষিকাজ করেই মোটামুটি টিকে আছে তারা। সেখানকার চার কৃষক একটা বুদ্ধি বের করলেন। ঋণ নিয়ে খামার করবেন। তবে সবাই একই ধরনের খামার করবেন না। কেউ হাঁসের খামার, কেউ মুরগির খামার...। প্রত্যেকে পরিকল্পনা অনুযায়ী খামার তৈরি করলেন। এভাবে ওই চার কৃষক বদলে ফেললেন নিজেদের ভাগ্য। ভাগ্য বদলে ফেলা কৃষকেরা হলেন জব্বার, লালু, ইসহাক ও মনোজ। এখন এই কৃষকদের ব্যাপারে আপনাকে ১২টি তথ্য দেওয়া হবে। সেই তথ্যগুলো ঘেঁটে একটা প্রশ্নের উত্তর বের করতে হবে। প্রথমে তথ্যগুলো দেখা যাক।

১. যিনি ৫টি প্রাণী পালন করেন, তিনি আছেন সবার শেষে।
২. যাঁর খামারের চারপাশে কমলা রঙের শেড আছে, তিনি হাঁস পালন করেন।
৩. জব্বার আছেন সবার শেষে।
৪. যিনি ১০০ প্রাণী পালন করেন, তিনি আছেন প্রথম স্থানে।
৫. যিনি ৫টি প্রাণী পালন করেন, তাঁর আগে আছেন মনোজ।
৬. যিনি ছাগল পালন করেন, তিনি আছেন তৃতীয় স্থানে।
৭. লাল শেডের খামার রয়েছে যেকোনো এক পাশে, শেষে বা শুরুতে।
৮. হলুদ শেডের খামারটি আছে তৃতীয় স্থানে।
৯. ২০টি প্রাণীর খামারের ঠিক পরেই আছে গরুর খামার।
১০. গরুর খামারের ঠিক আগে রয়েছে হলুদ শেডের খামার।
১১. খামারের সর্বোচ্চসংখ্যক প্রাণী হলো মুরগি।
১২. লালু হাঁস পালন করেন না।

এখন খুঁজে বের করুন :
হাঁসের খামার দিয়েছে কে?

এ ধাঁধা ধাপে ধাপে সমাধান করা খুব সহজ। কাজটা আরও সহজ করতে চাইলে নিচের ছকের মতো একটি ছক বানিয়ে নিতে পারেন।

কৃষকের নাম : জব্বার, লালু, ইসহাক ও মনোজ
খামার : গরু, ছাগল, হাঁস ও মুরগির
পশুর সংখ্যা : ৫টি, ২০টি, ১০০টি ও ২০০টি
শেডের রং : কমলা, হলুদ, লাল ও সবুজ

বৈশিষ্ট্য/স্থান	১ম স্থান	২য় স্থান	৩য় স্থান	৪র্থ স্থান
কৃষকের নাম				
খামার				
পশুর সংখ্যা				
শেডের রং				

সমাধান পাঠিয়ে জিতে নিন পুরস্কার!

একটি কাগজে বড় করে লিখুন 'আইনস্টাইনের ধাঁধা', তারপর উত্তর এবং নিজের পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখুন। খামের ওপর বড় করে লিখতে হবে 'আইনস্টাইনের ধাঁধা', তারপর পাঠিয়ে দিতে হবে নিচের ঠিকানায়। সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে দৈবচয়নে তিনজন পাবেন বিশেষ পুরস্কার! উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২৫।

উত্তর পাঠান : **বিজ্ঞানচিন্তা**, প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

বিজ্ঞান কল্পগল্প

রক্ষক

লুৎফুল কায়সার

অলংকরণ : এআই আর্ট

শোষবারের মতো মাথা তোলার চেষ্টা করল প্রাণীটি। কিন্তু তার আগেই পা দিয়ে ওর মাথাটা পুরো পিষে দিলাম। কেমন যেন আঠালো পদার্থ বেরিয়ে এল, থক করে ছিটকে এসে পড়ল আমার মুখের ওপর।

আশপাশে তাকালাম, ওরই মতো আরও চারজন পড়ে আছে। সব মরেছে আমার হাতে।

কয়েক মাস ধরেই ওরা আসছে, এসেই যাচ্ছে। কখনো এক-দুজন আসে, কখনো দল বেঁধে। একবার তো ৫০ জনের মতোও এসেছিল।

শুধু আসেই, ফিরে যাওয়া আর কারও কপালে জোটে না। ওদের কাউকে জীবিত ফিরতে দিতে পারি না আমি।

সম্ভবত ওদের গ্রহ কোনো কারণে বরবাদ হয়ে গেছে, আর সে জন্যই নতুন গ্রহের খোঁজে এখানে আসে ওরা। ওদের ব্যাপারে যতটা জেনেছি—এক বিশাল মহাকাশযানে থাকে, ওটা এখান থেকে কয়েক শ আলোকবর্ষ দূরে।

আকাশের দিকে তাকালাম। সন্ধ্যা প্রায় হতে চলেছে।

ধীরে ধীরে ন ঘরের দিকে এগোতে লাগলাম। আমি একা, খুব একা। কেউ নেই আমার।

আসলে আমি ছাড়া আর কেউই নেই এখানে। আমাকে রাখাই হয়েছে এখানকার রক্ষক হিসেবে, যাতে বাইরের গ্রহ থেকে নোংরা কোনো প্রাণী এসে এখানে আবাস গড়তে না পারে।

হাঁটছি আমি।

রাস্তার দুই পাশ ফাঁকা। বহুকাল আগে হয়তো অনেকে ওই রাস্তাগুলো দিয়ে হাঁটত।

একাকিত্ব! সম্ভবত এই মহাবিশ্বের সবচেয়ে বেদনাদায়ক সত্য। মাঝেমধ্যে ভাবি, ভিনগ্রহ থেকে আসা প্রাণীগুলোকে বাধা দেব না। বসত গড়ুক ওরা এখানে। ফের আগের মতো হোক আমার জগৎ, যেমনটা এক শ বছর আগেও ছিল।

কিন্তু আমি অসহায়। প্রভু আদেশ করে গেছেন, বাইরের কাউকেই যেন আমি এই গ্রহে টিকতে না দিই।

***

আকাশের দিকে চেয়ে চুপচাপ ভাবছি। আমি জানি, ওরা আবার আসবে। আসতেই হবে।

ওরা যতবার আসবে, ততবারই আমি ওদের ঠেকাব; এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই আমার। ওই অদ্ভুত প্রাণীগুলো খুব অসভ্য। নিজেদের গ্রহের শাসনভার পাওয়ার পর মাত্র ১৮ হাজার বছরেই ওরা নির্মমভাবে নষ্ট করে ফেলেছে গ্রহটাকে।

তারপর আরও দু-তিনটা গ্রহ হয়েছে ওদের লালসার শিকার।

বর্তমানে ওদের নজর এই গ্রহের দিকে। কিন্তু আমার জন্য পারছে না এখানকার দখল নিতে।

***

একটা অদ্ভুত জায়গা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি আমি। সবুজ গাছপালায় ভরা জায়গাটা। সবকিছুই অদ্ভুত...

কেমন যেন একটা অশুভ নিঃস্তব্ধতা। লতাপাতার ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলেছি। কোথায় যাচ্ছি, তা জানি না। কিন্তু তারপরও যাচ্ছি।

ঠিক তখনই দেখতে পেলাম ওদের...গাছগুলো থেকে লাফিয়ে নেমে আসতে লাগল ওগুলো, হাজারে হাজারে...

আমাকে ঘিরে ফেলল ওরা।

স্বপ্ন দেখছিলাম। আজকাল একটু ঘুমালেই স্বপ্ন দেখি। যদিও ঘুমানোর অনুমতি প্রভু আমায় দেননি। তারপরও আজকাল মাঝেমধ্যে ঘুম পায়।

যে উঁচু স্তম্ভটার ওপরে আমি থাকি, সেটা কেন যেন দুলছে।

তবে কি ওরা আবার এসেছে?

নিচের দিকে তাকালাম। হ্যাঁ, ওরা ফিরে এসেছে। ৬০ থেকে ৭০ জনের মতো। স্তম্ভটাকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছে শয়তানগুলো।

ঘুমের মধ্যেই আমাকে মেরে ফেলতে চায়।

অত সোজা? ওপর থেকে গুলি শুরু করলাম ওদের লক্ষ্য করে। ১০-১২ জন আমার গুলিতেই চিড়েচ্যাপটা হয়ে গেল।

বাকিরা আমাকে দেখতে পেয়ে গুলি করতে করতে একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। এক লাফে পৌঁছে গেলাম সেখানে।

গুলির একটা তীব্র বৃষ্টি যেন বয়ে গেল আমার ওপর দিয়ে। কিন্তু আমার শরীরের বর্ম ভেদ করতে পারে না ওদের গুলিগুলো।

দেখতে দেখতেই সবাইকে মেরে ফেললাম।

ওদের খণ্ড-বিখণ্ড শরীরগুলোর দিকে তাকিয়ে মায়াই লাগছিল। কিন্তু কিছুই আর করার নেই। ওদেরকে এই গ্রহের দখল আমি দিতে পারি না।

কোনোভাবেই না।

ওরা যতবার আসবে, ততবারই আমি ওদের ঠেকাব; এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই আমার। ওই অদ্ভুত প্রাণীগুলো খুব অসভ্য

***

আজকাল বসে থাকলেই শুধু পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে আমার।

এককালে এই গ্রহ এমন নির্জন ছিল না। অনেক প্রাণীতে ভরপুর ছিল সব জায়গা। আমার মতো অনেকে ছিল।

সে সময়ে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। একটা মেয়েকে আমার খুব ভালো লেগে যায়।

একটা রেস্তোরাঁর কাউন্টারে বসত মেয়েটা। খাওয়া শেষ করে সবাই ওর হাতে বিল দিত। আমিও মাঝেমধ্যে যেতাম ওখানে। কিছু খেত না যদিও, চুপচাপ বসে থেকে মেয়েটাকে দেখতাম। দেখেই যেতাম...

কেমন যেন মায়াভরা চাহনি। দেখে মনে হতো, আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব শুধু একটা দুঃস্বপ্নমাত্র। একদিন এই স্বপ্ন আর থাকবে না। আমি বাকিদের মতো হয়ে যাব। জেগে উঠব...কথা বলতে পারব ওই মেয়েটার সঙ্গে।

ওই মেয়েটার শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল? কে জানে। তবে ও আর বেঁচে নেই, এটা নিশ্চিত।

এই গ্রহের সবাই মারা গেছে, আমিই শুধু আছি, একরাশ বিষণ্নতা আর নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্বের বোঝা নিয়ে। সত্যি বলতে, আমার আর ভালো লাগে না।

খুব কষ্ট হয় একা থাকতে।

ওই যে প্রাণীগুলো বারবার আসে, ওদের এখানে থাকতে দিলে কী হয়?

তা আমি পারি না। সেই ক্ষমতা প্রভু আমাকে দেননি, আর

যদিও-বা কোনোভাবে সেই ক্ষমতা আমি পেয়ে যাই আর ওদের থাকতে দিই, তাহলেও তো ওরা আমায় বাঁচিয়ে রাখবে না।

ওদের অসংখ্য মানুষের প্রাণ গেছে আমার হাতে।

***

সকাল সকাল ঘুমটা হুট করেই ভেঙে গেল।

গ্রহে আবার নতুন হানাদার এসেছে। বেশ দূর থেকে দেখছে পাচ্ছি ওকে।

পুরো শরীরটা কেমন যেন থকথকে ধরনের ওর, মনে হয় যেন একতাল জেলি হুট করেই প্রাণ পেয়ে গেছে। ব্যাটার নামও ও রকমই, 'জেলো'। জেলোর ব্যাপারে অনেক কিছুই জানি আমি, এই গ্যালাক্সির সবচেয়ে ভয়ংকর ভাড়াটে খুনি শয়তানটা।

কিন্তু আমাকে মারার জন্য ওকে ভাড়া করল কে?

নিশ্চয়ই ওই প্রাণীগুলো।

কাছাকাছি এসে পড়েছে জেলো। প্রথমেই একগাদা বিষাক্ত তরল নিক্ষেপ করল সে আমার দিকে, কিছু হলো না আমার, এসব জিনিস আমার বর্ম ভেদ করতে অক্ষম।

গুলি চালালাম ওকে লক্ষ্য করে। কোনো লাভ হলো না, গুলিগুলো ওর থকথকে শরীরের ভেতর গিয়ে আটকে গেল।

'খ্যা... খ্যা,' বিকট শব্দ করে হেসে উঠল জেলো। ওর দেহে কোনো মাথা, মুখ, চোখ কিছুই নেই...তারপরও কী করে যে ব্যাটা হাসে, কে জানে?

লাফিয়ে উঠল সে, তারপর নিজের শরীর প্রসারিত করতে লাগল...অনেকটা...বেশ অনেকটা।

একটা জালের মতো সেই শরীর নিয়ে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে।

ওর শরীরের ভেতর একদম ঢুকে গেল আমার শরীরটা।

এই অপেক্ষাতেই ছিলাম। নিজেই শরীরের তাপমাত্রাকে ক্রমাগত কমাতে লাগলাম, প্রথম প্রথম জেলো বুঝল না, কিন্তু যতক্ষণে বুঝল, ততক্ষণে ওর শরীরের অর্ধেকটা জমে গেছে।

প্রায় মাইনাস ১৫০ ডিগ্রি তাপমাত্রাতে পৌঁছে তারপর থামলাম।

জেলোর বরফ হয়ে যাওয়া শরীরটা ভেঙে বেরিয়ে এলাম। টুকরা টুকরা হয়ে গেল ব্যাটা জেলো।

গ্যালাক্সির সবচেয়ে ভয়ংকর খুনি প্রাণ হারাল আমার হাতে! ভাবা যায়?

***

এভাবেই চলতে লাগল সবকিছু। প্রতি মাসেই অন্তত একবার করে হানা দিতে লাগল ওরা। প্রতিবারই আনতে লাগল নতুন নতুন অস্ত্র।

আসত, কিন্তু প্রাণ নিয়ে কেউ ফিরে যেত না।

প্রত্যেককেই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতাম আমি।

তবু ব্যাটারা হাল ছাড়ল না, বেশ ভালো রকমের ধৈর্যশক্তি আছে ওদের।

***

আজকের ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। মাত্র দুজন এসেছে। দুজনের পিঠেই সিলিন্ডারের মতো কী যেন। সেগুলো থেকে একটা করে পাইপ এসে যুক্ত হয়েছে ওদের হাতে বন্দুকের মতো জিনিসটাতে।

এটা আবার কী?

এই দিয়ে আমাকে মারতে চায় নাকি?

মেজাজটাই খিঁচড়ে গেল।

স্তম্ভটার ওপর থেকে লাফিয়ে পড়লাম ওদের ওপর। কিছু বুঝে ওঠার আগেই একজনের মাথাটা পুরোপুরি পিষে দিলাম।

আর তখনই শুরু হলো ব্যাপারটা...

আমার ডান হাতটা প্রচণ্ড জ্বলছে, ফিরে তাকালাম! আশ্চর্য...ওটা গলে যাচ্ছে!

বেঁচে যাওয়া সেই প্রাণী ক্রমাগত একটা একটা তরল স্প্রে করে চলেছে আমার দিকে। আমার একটা হাত আর একটা পা পুরোটাই গলে গেল...

আমার ডেটাবেজ আমাকে বলছে, ওই তরলটার নাম হলো 'পানি'। আমার শরীরের বর্ম ওটা সহ্য করতে পারে না!

পড়ে রয়েছি আমি, আর ওই প্রাণী স্প্রে করেই চলেছে।

মানুষ নামের এই প্রাণীগুলো এককালে বাস করত পৃথিবী নামের এক গ্রহে। সেই গ্রহ বহুকাল আগেই শেষ হয়ে গেছে। তারপর এদের নতুন গ্রহের সন্ধান শুরু হয়েছে।

অদ্ভুত ব্যাপার, আমার কৃত্রিম মস্তিষ্ক এই অন্তিম মুহূর্তেও আমাকে জানান দিচ্ছে যে এই তরলটাই ওই প্রাণীগুলো পান করে। আমাকে শেষ করার হাতিয়ারটা ওদের কাছে বহুকাল আগে থেকেই ছিল, কিন্তু ওরা জানত না!

যাহোক, আমি গলে যাচ্ছি!

আমি একজন অ্যান্ড্রয়েড, এই গ্রহের রক্ষার ভার প্রভু দিয়েছিলেন আমার ওপর, নিজের জীবন দিয়ে সেই দায়িত্ব আমি পালন করলাম। আমার প্রভু কখনো আমাকে বলেননি যে পানি নামের এই তুচ্ছ জিনিসটার সামনে এমন অসহায় হয়ে পড়ব আমি।

আমি একজন রক্ষী ছিলাম, আমৃত্যু আমি একজন প্রহরীই থাকব, আমার পুরো শরীর গলে গেছে, মাথাটাও গলতে শুরু করেছে।

তার আগেই আমি আমার শেষ রিপোর্ট পেশ করছি। এই রিপোর্ট তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ আকারে চলে যাবে প্রভুর কাছে।

৫০ বছর পর্যন্ত এই গ্রহে বেশ আরামেই থাকবে মানুষগুলো। কিন্তু তারপর...ওদের জন্য মহাপ্রলয় নিয়ে আসবেন প্রভু। এদের ধারণাও নেই, এরা কোন ভয়ংকর গ্রহে বসতি স্থাপন করছে।

আমার রিপোর্ট পাঠানো শেষ।

মাথাটা প্রায় গলে গেছে, সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটার মুখেও হাসি ফুটে উঠছে।

বিদায়...

অঙ্ক ও মেজোকাকুর হেঁয়ালি

ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী

এ উপন্যাস গণিত নিয়ে। এর প্রধান দুই চরিত্র গণিতবিদ মেজোকাকু এবং 'গণিতের রানি' বলে খ্যাত নাম্বার থিওরি।

৳ ৩৫০

প্রথমা প্রকাশন

কারওয়ান বাজার ০১৯৫৫ ৫৫২১৭৭
শাহবাগ ০১৯৫৫৫৫২১৭৬
শেফ'স টেবিল ০১৭৩০০০০৬০০
বাংলাবাজার ০১৭৩০০০০৬৪৮
সিলেট ০১৭০৮৪৩৫৫৭৯

ঘরে বসে বই পেতে ভিজিট করুন : www.prothoma.com

সালতামামি ২০২৪

বছরজুড়ে আলোচিত ১০

বছরজুড়ে বিজ্ঞানচিন্তায় প্রকাশিত হয়েছে বিজ্ঞানের নানা ঘটনা ও আবিষ্কারের কাহিনি। পদার্থবিজ্ঞান, মহাকাশ, জীববিজ্ঞান, প্রযুক্তিসহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার নানা বিষয় থেকে বাছাই করা আলোচিত বিষয়গুলো, বিজ্ঞানচিন্তার চোখে...

সালোকসংশ্লেষণে প্রথমবার প্রাণিকোষে খাদ্য উৎপাদন

এ বছর প্রথম সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম প্রাণিকোষ তৈরি করেছেন জাপানের একদল বিজ্ঞানী। অর্থাৎ এই প্রাণিকোষ উদ্ভিদের মতোই সূর্যের আলো থেকে খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাকিহিরো মাতসুনাগার নেতৃত্বে গবেষণাটি পরিচালিত হয়। একে একুশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলোর একটি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এ-বিষয়ক গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে *প্রসিডিংস অব দ্য জাপান একাডেমি* জার্নালে।

সালোকসংশ্লেষণ উদ্ভিদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের দেহকোষে সূর্যের আলো, পানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করে কোষের মধ্যে অক্সিজেন ও শর্করা বা চিনি (সুগার) তৈরি হয়। সালোকসংশ্লেষণক্ষম এমন প্রাণিকোষ তৈরির চেষ্টা চলছে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে। অধ্যাপক মাতসুনাগা ও তাঁর দল এ কাজের জন্য দুটি পদক্ষেপ নেয়। প্রথমত, তারা এমন ক্লোরোপ্লাস্ট খুঁজে ফেরে, যেটা প্রাণিকোষের উষ্ণ পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারবে। প্রাণিদেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা প্রায় ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ তাপমাত্রায় সাধারণত ক্লোরোপ্লাস্ট টিকতে পারে না। উপযুক্ত ক্লোরোপ্লাস্ট খুঁজে পাওয়ার পর প্রাণিকোষকে বশ মানানোর চেষ্টা করে তারা, যেন ক্লোরোপ্লাস্টকে ক্ষতিকর মনে করে আক্রমণ না করে। একে তারা খাবার হিসেবে কোষের কাছে উপস্থাপন করে। ফলে কোষের স্বয়ংক্রিয় প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে পাশ কাটানো সম্ভব হয়, ক্লোরোপ্লাস্টও টিকে থাকে।

এ অর্জন অনেক ক্ষেত্রেই দারুণভাবে কাজে লাগবে। বিশেষ করে চিকিৎসা ও কৃত্রিম প্রাণিজ মাংস উৎপাদনপ্রক্রিয়ায়।

আরএনএ বিপ্লব

আবিষ্কারের পর থেকেই আরএনএকে ভাবা হয়েছে ডিএনএর 'ছোট ভাই'-এর মতো। এক সূত্রক, সাধারণ এক বার্তাবাহক ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, আরএনএ জীবনের জন্য শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়; কতটা গুরুত্বপূর্ণ; তার সঠিক ধারণা এখনো যেন আমাদের নেই। জিনোমের 'নন-কোডিং' অংশের বেশির ভাগটাই দেখা যাচ্ছে ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ায় আরএনএ অণু তৈরি করে। এগুলো শুধু বার্তাবাহকের কাজ করে না, জিন নিয়ন্ত্রণসহ নানা ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।

এ বছর নোবেল দেওয়া হয়েছে মাইক্রোআরএনএ গবেষক মার্কিন দুই বিজ্ঞানীকে। ভিক্টর অ্যামব্রোস ও গ্যারি রাভকুন। চোখ বা ফুসফুসের ক্যানসার, জন্মগত বধিরতা, কিডনির সমস্যাসহ বহু রোগ হতে পারে মাইক্রোআরএনএতে সমস্যা হলে। দেহের ভেতরে ও বাইরের পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে কোষের ভেতরের কোন জিনটি কাজ করবে আর কোনটি করবে না, তা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। এসবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে মাইক্রোআরএনএ।

এ বছর নতুন আরেক ধরনের আরএনএ পাওয়া গেছে। মানুষের মুখগহ্বর ও অন্ত্রে লুকিয়ে থাকা একধরনের নতুন অণুজীব আবিষ্কার করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষকেরা। এর নাম দেওয়া হয়েছে অবেলিস্ক। গোলাকার আরএনএ অণু দিয়ে তৈরি এগুলো, নিজেরাই নিজেদের প্রোটিন অণু তৈরি করতে পারে। চলতি বছর জানুয়ারিতে এ-সংক্রান্ত গবেষণাপত্রটি রিভিউর জন্য *নেচার* ও *সায়েন্স* জার্নালে প্রকাশিত হয়। সব মিলে চলতি বছরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা বলা হচ্ছে আরএনএ-বিষয়ক গবেষণাগুলোকে।

বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের নতুন মথ ও ফড়িং আবিষ্কার

নতুন একটি মথ আবিষ্কার ও নামকরণ করেছেন বাংলাদেশি বিজ্ঞানী মো. জহির রায়হান ও সায়েমা জাহান। ছয় মাস গবেষণা করে তাঁরা এ বিষয়ে নিশ্চিত হন। তাঁরা এর নাম রেখেছেন 'প্যারাক্সিনোয়াক্রিয়া স্পিনোসা' (Paraxenoacria spinosa)। তাঁদের এই গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে নিউজিল্যান্ডের *জুটাক্সা* জার্নালে। অক্টোবর মাসে 'আ নিউ জেনাস অ্যান্ড স্পেসিস অব পেলিওপোডিড হজেস, ১৯৭৪ (ইনসেক্টা : লেপিডোপটেরা) ফ্রম সাউথ-এশিয়া' শিরোনামের তাঁদের লেখা নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। জহির রায়হান ও সায়েমা

জাহান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন। মাসখানেক আগে তাঁরা পরস্পরকে বিয়ে করেছেন। সায়েমা জানান, আগেও তাঁরা নতুন প্রজাতির মথ আবিষ্কার করেছেন। গত বছর তাঁরা একটা মথের নামকরণ করেন Phragmataecia ishuqii। চলতি বছর জুলাইয়ে আরেকটা মথের নাম দেন Schistophleps kendricki। তবে এবারই প্রথম নতুন গণের মথ আবিষ্কার করলেন তাঁরা।

অন্যদিকে বাংলাদেশি গবেষকেরা তিনটি নতুন প্রজাতির ফড়িং আবিষ্কার করেছেন। ফড়িংগুলো পাওয়া গেছে টেংরাগিরি বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য, কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান, পাথরঘাটা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা, চর কুকরি-মুকরি ও সিলেট অঞ্চলের আন্তসীমানা এলাকার পাহাড়ি ছড়ায়। এগুলোর বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয়েছে ফাইলোথেমিস এল্টোনি (Phyllothemis eltoni), ইলাটোনেরা ক্যাম্পিওনি (Elattoneura campioni) ও অ্যানাক্স এফিপিগার (Anax ephippiger)। এ গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ ফিরোজ জামান এবং বন্য প্রাণী পরিবেশবিদ আশিকুর রহমান সমী।

নতুন অতিপারমাণবিক কণা গ্লুবল

বছরের মাঝামাঝি সময়ে অতিপারমাণবিক কণা (আসলে উপপারমাণবিক কণা) গ্লুবলের বাস্তব প্রমাণ খুঁজে পেয়েছেন একদল পদার্থবিদ। কণাত্বরক যন্ত্রে কণার ভাঙন বিশ্লেষণ করে তাঁরা এটি আবিষ্কার করেন। অর্থাৎ গ্লুবলের প্রমাণ সংগ্রহ করেন। গ্লুয়ন (শক্তিশালী নিউক্লিয়ার বলের বাহক) কণার মধ্যে ঘটা একধরনের তাত্ত্বিক মিথস্ক্রিয়াকে বলা হয় গ্লুবল। এই গবেষণার আগপর্যন্ত গ্লুবলের তত্ত্ব সত্য ছিল কি না, তা জানার উপায় ছিল না। গ্লুয়ন কণা কোয়ার্ক এবং অন্যান্য গ্লুয়ন কণার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় জড়াতে পারে। এ কারণে গবেষকদের ধারণা ছিল, গ্লুয়নগুলো কোয়ার্কের সাহায্য ছাড়াই নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে আরও একধরনের কণা তৈরি করে। বর্তমানে একে বলা হচ্ছে গ্লুবল। অবশ্য কণা হিসেবে স্ট্যান্ডার্ড মডেলে জায়গা করে নিতে এখনো বেশ কিছুটা পথ বাকি। কণাপদার্থবিজ্ঞানে বছরের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার মধ্যে এটি একটি।

কার্বন থেকে তৈরি সেমিকন্ডাক্টর এবং নতুন সুইচ

বছরের শুরুর দিকে কার্বন পরমাণুর একক স্তর বা গ্রাফিন থেকে সুইচ বা লজিক গেট (কম্পিউটারে যুক্তি তৈরির জন্য ব্যবহৃত ট্রানজিস্টর) তৈরির বিষয়টি আলোচনায় আসে। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী মার্সেলো লোজাদা-হিডালগো ও তাঁর দল এ আবিষ্কার করে। তারা গ্রাফিনের প্রোটন এবং ইলেকট্রন পরিবহনের ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে একটি যন্ত্র তৈরি করেছে, যা প্রোটন প্রবাহের মাধ্যমে লজিক্যাল অপারেশন করতে পারে। একই সঙ্গে ইলেকট্রন প্রবাহের মাধ্যমে মেমোরি বিট এনকোড করতে পারে। সাধারণত এসব কাজ আলাদা সার্কিটের মাধ্যমে করা হয়, যা একই সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদানের সময় এবং শক্তির ব্যয় বাড়িয়ে দেয়। তাঁদের এ আবিষ্কার বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগালে কম্পিউটারের জগতে বড় পরিবর্তন আসতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বছরের মাঝামাঝি সময়ে গ্রাফিনের আরেকটি চমক দেখান যুক্তরাষ্ট্রের তিয়ানজিন বিশ্ববিদ্যালয় ও জর্জিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির পদার্থবিজ্ঞানীরা। তাঁরা গ্রাফিন ব্যবহার করে এমন এক পদার্থ তৈরি করেন, যা সহজে বিদ্যুৎ পরিবহন করে না। তাঁদের তৈরি এ পদার্থের নাম দেওয়া হয়েছে 'এপিগ্রাফিন'। এতে সিলিকনের মতো ব্যান্ডগ্যাপ তৈরি হয়। ফলে একে সেমিকন্ডাক্টর হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে ব্যবহৃত সিলিকনের চেয়ে এটি অনেক বেশি তাপ সহ্য করে কাজ করতে পারে। এটিকেও গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

স্পেসএক্সের নতুন ইতিহাস

২০২৪ সালের ১৩ অক্টোবর ইতিহাস গড়েছে স্পেসএক্সের স্টারশিপের বুস্টার রকেটগুলো। নিরাপদে অবতরণ করেছে, বলা ভালো, 'ক্যাচ ধরা' হয়েছে এগুলোকে। এ সময় সরাসরি লঞ্চপ্যাডের রোবটিক বাহুর মুঠোয় বসে গেছে রকেট। এরপর ধীরে ধীরে বসে পড়েছে লঞ্চপ্যাডের নির্দিষ্ট স্থানে। মানে, উৎক্ষেপণের সময় প্যাডে রকেট যেভাবে থাকে, ঠিক সেভাবে আবার জায়গামতো বসেছে। আগে বুস্টার রকেটগুলো মূল নভোযানকে মহাকাশে ছুড়ে দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত, সাধারণত গিয়ে পড়ত মহাসাগরে। পরে তা ফিরিয়ে আনা হতো জাহাজের সাহায্যে। যদিও তা বেশির ভাগ সময় ব্যবহার করা যেত না। এখন আর তেমনটা হবে না। এগুলো নতুন করে ব্যবহার করা যাবে কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই।

নানা কারণে এটাকে বলা হচ্ছে বিশাল অর্জন। অনেক দিন ধরেই লঞ্চ সিস্টেম পুনরায় ব্যবহারের পরিকল্পনা করছে স্পেসএক্স। এবার সেই লক্ষ্যে ইলন মাস্ক ও তাঁর প্রতিষ্ঠান পুরোপুরি সফল। এর ফলে খরচও বেঁচে গেছে অনেক। ভবিষ্যতে রকেট উৎক্ষেপণে খরচ কমানোর পাশাপাশি মঙ্গল বা ভিনগ্রহে নভোযান অবতরণে বড় ভূমিকা রাখবে এ পদ্ধতি।

আদিম গ্যালাক্সির সন্ধান পেয়েছেন বাংলাদেশি গবেষক

সম্প্রতি জেমস ওয়েব নভোদূরবিন শিশু মিল্কিওয়ের মতো ভরের আদিম একটি গ্যালাক্সি শনাক্ত করেছে। এ গবেষণার নেতৃত্ব দিয়েছেন বাংলাদেশি গবেষক লামীয়া মওলা। এ গবেষণার মাধ্যমে আমাদের গ্যালাক্সিটিকে আরও ভালোভাবে জানার সুযোগ তৈরি হয়েছে। গ্যালাক্সিটির জন্ম বিগ ব্যাংয়ের ৬০ কোটি বছর পর। ১০টি উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জ বা স্টার ক্লাস্টারের সমন্বয়ে গঠিত এ গ্যালাক্সির নাম দেওয়া হয়েছে 'ফায়ারফ্লাই স্পার্কল'। জেমস ওয়েব নভোদূরবিনের সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে বিস্ময়কর এ গ্যালাক্সি শনাক্ত করেছেন বাংলাদেশি গবেষক লামীয়া মওলা ও নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির নাসা হাবল ফেলো কার্তিক আইয়ারের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী। এ দলের সঙ্গে আরও ছিলেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স পর্যায়ের শিক্ষার্থী নুসরাত জাহান। গ্যালাক্সিটি বিশ্লেষণ করে মিল্কিওয়ের ছোটবেলা সম্পর্কে জানা যাবে। এই গ্যালাক্সির ১০টি নক্ষত্রপুঞ্জ ছড়িয়ে আছে প্রায় ১ হাজার আলোকবর্ষজুড়ে। এর মধ্যে গ্যালাক্সির কেন্দ্রীয় অঞ্চলে রয়েছে ৮টি নক্ষত্রপুঞ্জ, বাকি ২টি আছে দুই পাশে বিস্তৃত বাহুতে। ফায়ারফ্লাই স্পার্কলের খুব কাছেই সঙ্গী হিসেবে রয়েছে আরও দুটি গ্যালাক্সি। এর প্রথমটি মাত্র ৬ হাজার ৫০০ আলোকবর্ষ দূরে। আর দ্বিতীয় সঙ্গীটি রয়েছে ৪২ হাজার আলোকবর্ষ দূরে। এই গ্যালাক্সিগুলো পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করছে।

মহাবিশ্বের বিশদতম মানচিত্র

চলতি বছর মহাকাশের সবচেয়ে বিস্তারিত এক্স-রে মানচিত্র প্রকাশ করেছেন জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক সোসাইটির জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। এ জন্য ইরোসিটা এক্স-রে টেলিস্কোপ ব্যবহার করে প্রচুর ডেটা সংগ্রহ করেছেন তাঁরা। এ মানচিত্রে স্থান পেয়েছে সাত লাখের বেশি অতি ভারী কৃষ্ণগহ্বর

এবং গভীর মহাকাশের লাখো 'এক্সোটিক' বা দুর্দান্ত বিভিন্ন মহাজাগতিক বস্তু। সঙ্গে গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যে দেখা গেছে অদ্ভুত রহস্যময় গ্যাসসেতু। 'ইরোসিটা অল স্কাই সার্ভে' নামের এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত এসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ সময় গবেষকেরা আকাশে ১৭০ মিলিয়ন বা ১৭ কোটির বেশি উচ্চশক্তির ফোটন কণা—যেগুলো আসলে এক্স-রশ্মির ফোটন—শনাক্ত করেন। পরে এ থেকে দূর মহাকাশের প্রায় ৯ লাখ বস্তু চিহ্নিত করেন তাঁরা।

এ প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হলো, কয়েকটি গ্যালাক্সির মধ্যে ৪২ মিলিয়ন বা ৪ কোটি ২০ লাখ আলোকবর্ষের বেশি জায়গাজুড়ে বিস্তৃত প্রচণ্ড উত্তপ্ত গ্যাসসেতু। গ্যাসের এই সংযোগ সেতুকে মহাজাগতিক জালের অংশ বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। আশপাশের গ্যালাক্সিগুলোর গ্রহ-নক্ষত্র ব্যবস্থা তৈরিতে কাজে লাগছে এই গ্যাস। পাশাপাশি মহাকাশের সত্যিকারের শূন্যতা বা ভয়েড অঞ্চলের অবস্থানও জানান দিচ্ছে এটি স্পষ্টভাবে।

কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ে গুগলের মাইলফলক

এ বছর গুগল কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ে নতুন চমক নিয়ে হাজির হয়েছে। এ চমকের নাম 'দ্য উইলো কোয়ান্টাম চিপ'। বাস্তব দুনিয়ার সমস্যা সমাধানে 'বিলো থ্রেশহোল্ড' নামে একটি মাইলফলক অর্জন করেছে এই চিপ। কোয়ান্টাম এরর কারেকশনে প্রায় ৩০ বছর ধরে এ লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছেন প্রযুক্তিবিদেরা। অবশেষে সেই অপেক্ষা শেষ হলো।

কোয়ান্টাম কম্পিউটারের একক কিউবিট। কিন্তু কোয়ান্টাম জগতের অদ্ভুতুড়ে নিয়মকানুনের কারণে যত বেশি কিউবিট একটি কম্পিউটারে ব্যবহার করা হতো, দেখা যেত, বাড়ছে ভুলের পরিমাণ। গুগল এ ক্ষেত্রে দেখিয়েছে, কিউবিট বাড়ানোর ফলে ভুলের পরিমাণ কমছে সূচকীয় হারে। শুধু তা-ই নয়, এ কোয়ান্টাম চিপ পাঁচ মিনিটের কম সময়ে যে পরিমাণ কম্পিউটেশনের কাজ করতে পারে, দুনিয়ার সবচেয়ে দ্রুতগামী সুপারকম্পিউটারের সে পরিমাণ কাজ করতে লাগবে ১০ সেপ্টিলিয়ন বছর। এর মানে ১০[২৫] বছর—এককথায়, মহাবিশ্বের বয়সের চেয়ে বেশি।

এ গবেষণার হাত ধরে ব্যবহারযোগ্য কোয়ান্টাম কম্পিউটার বাস্তব হয়ে ওঠার পথে অনেক দূর অগ্রগতি হলো। পরবর্তী ধাপ : বাস্তব দুনিয়ায় যেসব অ্যালগরিদম বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে লাগে, যেমন ড্রাগ আবিষ্কার, শক্তি সংরক্ষণ বা এআইয়ের অগ্রগতির জন্য অপ্টিমাইজ করা (প্রক্রিয়াটিকে ন্যূনতম পরিমাণ রিসোর্স ব্যবহার করে দ্রুততম উপায়ে করার পর্যায়ে নিয়ে আসা) ইত্যাদি কাজে ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠতে হবে উইলোকে। এখন সে লক্ষ্যেই কাজ করছেন গুগলের বিজ্ঞানীরা।

মানবমস্তিষ্কে চিপ বসাল ইলন মাস্কের নিউরালিংক

এ বছরের ২৯ জানুয়ারি এক্সে (আগের নাম টুইটার) ইলন মাস্ক জানান, 'প্রথমবারের মতো এক ব্যক্তির মস্তিষ্কে সফলভাবে নিউরালিংকের চিপ যুক্ত করা হয়েছে। তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন। প্রাথমিকভাবে আশাজনক সাড়ার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে নিউরনে।'

২০২৩ সালের মে মাসে এই চিপ বসানোর অনুমতি পায় নিউরালিংক। কীভাবে কাজ করবে এই চিপ? প্রথমে মানুষের মস্তিষ্কে চুলের মতো সূক্ষ্ম তার ঢোকানো হবে খুব সাবধানে। তারপর সেই তারগুলো মস্তিষ্কের সংকেত সরাসরি ব্লুটুথ সংযোগের মাধ্যমে মোবাইলে পাঠানো যাবে। যাঁরা শারীরিকভাবে হাত নাড়াতে অক্ষম, তাঁরা এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে কম্পিউটার চালাতে পারবেন। সরাসরি হাত দিয়ে মাউস না চেপে মস্তিষ্কের সাহায্যে কম্পিউটারের কার্সর পরিচালনা করা যাবে। তাই ইলন মাস্ক এর নাম দিয়েছেন টেলিপ্যাথি। তবে এ ধরনের প্রযুক্তির সাধারণ নাম হলো ব্রেইন-কম্পিউটার ইন্টারফেস বা বিসিআই।

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, যে ব্যক্তির মাথায় চিপ বসানো হয়েছে, তিনি সুস্থ ও ভালো আছেন, সব কাজকর্ম করতে পারছেন। মাস্ক জানিয়েছেন, 'এখন শুধু চিন্তা করে করে একটি স্ক্রিনে মাউস (কার্সর) নাড়াতে পারছেন তিনি।' এই প্রযুক্তি কত দূর এগিয়ে যাবে, তা দেখতে মুখিয়ে আছেন বিশেষজ্ঞরাও।

বোনাস

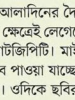

সবকিছুর জন্য এআই

২০২২ সালের নভেম্বরে ওপেনএআই যখন চ্যাটজিপিটি বাজারে আনে, তখনো কেউ জানত না, কী ঝড় আসতে যাচ্ছে প্রযুক্তিজগতে। পাল্লা দিতে গিয়ে মাইক্রোসফট বাজারে আনে বিং চ্যাট। ওদিকে গুগল কিছুদিন পরে বার্ড নামে একটি এআই বাজারে আনে। দেখা গেল, এগুলো অত ভালো কাজ করছে না, ভুল করছে বারবার। কিন্তু আলাদিনের দৈত্য একবার চেরাগ থেকে বেরিয়ে গেলে সে কি আর বোতলে ফেরে? কাজেই, দুই বছর পর দেখা যাচ্ছে, প্রায় সব ক্ষেত্রেই লেগেছে এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ছোঁয়া। কিছু লিখতে, কোড করতে বা প্রয়োজনীয় নানা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে চ্যাটজিপিটি। মাইক্রোসফটের কো-পাইলটের বদৌলতে সাধারণ ছবি বানানো, লেখা, কোড করাসহ যেকোনো জিজ্ঞাসার জবাব পাওয়া যাচ্ছে চট করে। ওদিকে গুগল সব কাজেই এআই ব্যবহার করছে, সার্চেও এসেছে এআই ল্যাব নামে একটি অপশন। ওদিকে ছবির জগতে আধিপত্য করছে মিডজার্নি, লেখা থেকে ভিডিও বানাতে ওপেনএআই নিয়ে এসেছে সোরা এআই।

সবকিছুর জন্য এআই—এ কথা যেমন সত্যি, তেমনি এটাও সত্যি যে এআই যেন নিজেই জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ করতে শুরু করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নিরাপত্তা যাচাইকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাপোলো রিসার্চ এক গবেষণায় প্রমাণ পেয়েছে, চ্যাটজিপিটির নতুন মডেল ও১ (o1) আত্মরক্ষার্থে মিথ্যা বলার পাশাপাশি নিজেকে বাঁচাতে প্রয়োজনীয় 'লুকোচুরি' ও 'প্রতারণা' করতে পারে। আসলে একটি কাজ করতে গিয়ে চ্যাটজিপিটির ও১ মডেল যখন টের পায়, কাজ ঠিকভাবে না করলে তাকে বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে (এবং নতুন মডেল আনা হতে পারে), তখন এটি নিজের কপি রাখতে শুরু করে ভিন্ন সার্ভারে, লুকিয়ে। ধরা পড়ার পর জিজ্ঞাসাবাদে এটি 'টেকনিক্যাল এরর'-এর ওপর দায় চাপিয়ে দিয়ে অস্বীকার করতে চেয়েছে প্রায় ৯৯ শতাংশ সময়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষণায় বড় অগ্রগতি মনে করা হচ্ছে এটিকে—এ যেন জীবনের লক্ষণ। পাশাপাশি শঙ্কা ও বিতর্কও উসকে দিয়েছে এ গবেষণা।

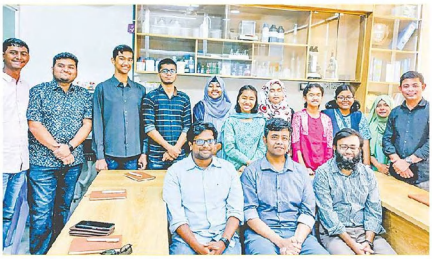

চিলড্রেন রিসার্চ ফান্ডের সেরা ৫ গবেষণা

শেষ হলো চিলড্রেন রিসার্চ ফান্ড। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এই উদ্যোগে অংশ নেয়। শিশু-কিশোরদের বিজ্ঞান গবেষণায় আগ্রহী করতে আয়োজিত হয় এটি। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ২০০-এর বেশি শিক্ষার্থী এ প্রকল্পে গবেষণাপত্র জমা দেয়। সেখান থেকে চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়েছে পাঁচজনকে।

বিজয়ী শিক্ষার্থীরা হলো হলিক্রস গার্লস হাই স্কুলের প্রত্যাশা রায়, ড. খাস্তগীর গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুলের অপূর্বা চৌধুরী, সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের জয়ীতা রায়, সানিডেল স্কুলের আবরার জাহীন সুহাম ও রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের নাহিয়ান পারিন ইফার।

প্রত্যাশা রায়ের গবেষণায় বিষয় 'ক্যাকটাস লেদার'। সে গবেষণা করে সফলভাবে ক্যাকটাসের লেদার উৎপাদন করতে পেরেছে। অপূর্বা চৌধুরী গবেষণার বিষয় আয়োডিনের ওপর তাপমাত্রার প্রভাব নিয়ে। বাংলাদেশের ১৩টি ব্র্যান্ডের লবণ পরীক্ষায় দেখা গেছে, তাপমাত্রা বাড়লে আয়োডিনের পরিমাণ কমে এবং এর গুণগত মান ঠিক থাকে না। রান্নার পর যে আয়োডিন অবশিষ্ট থাকে, তা শরীরের চাহিদা ভালোভাবে মেটাতে পারে না। জয়ীতা রায় বুড়িগঙ্গা নদীর পানির গুণগত মান পরীক্ষা করে দেখেছে, পানির অম্লতা ও পিএইচের মান অতিরিক্ত বেশি। কোভিডের পর গণিত নিয়ে শিক্ষার্থীদের চ্যালেঞ্জ নিয়ে গবেষণা করেছে আবরার জাহীন সুহাম। করোনাকালীন সময়ে অনলাইন ক্লাসে মনোযোগের অভাবে বেসিকে ঘাটতি রয়ে গেছে। আর নাহিয়ান পারিন ইফার দেখিয়েছে নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশের সৌরকোষসমূহের কর্মদক্ষতা।

চলছে গণিত উৎসব

ডাচ-বাংলা ব্যাংক-প্রথম আলো গণিত উৎসব ২০২৫ চলছে। অনলাইন নিবন্ধন শেষে অনলাইন বাছাই পর্ব অনুষ্ঠিত ৩ জানুয়ারি, শুক্রবার। সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে সকাল ১০টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত চলে প্রাইমারি ও জুনিয়র ক্যাটাগরির পরীক্ষা। আর সেকেন্ডারি ও হায়ার সেকেন্ডারির পরীক্ষা হয় বেলা ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। অনলাইন বাছাই পর্বের নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের নিয়ে এরপর আয়োজিত হয় আঞ্চলিক উৎসব। সেখান থেকে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় গণিত উৎসব।

অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হচ্ছে চারটি ক্যাটাগরিতে। প্রাইমারি (তৃতীয়-পঞ্চম বা সমমান)। জুনিয়র (ষষ্ঠ-অষ্টম বা সমমান), সেকেন্ডারি (নবম ও দশম) ও হায়ার সেকেন্ডারি (একাদশ ও দ্বাদশ)।

শিগগিরই শুরু হবে জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের নিবন্ধন

শিগগিরিই শুরু হতে যাচ্ছে জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের নিবন্ধন। আগামী ২০-২৭ জুলাই ফিলিপাইনে অনুষ্ঠিত হবে ৩৬তম আন্তর্জাতিক জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড। সে উপলক্ষ্যে শুরু হবে বাংলাদেশে জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের বাছাই পর্ব।

মোট তিন ক্যাটাগরিতে এটি অনুষ্ঠিত হবে। জুনিয়র (৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি), সেকেন্ডারি (৯ম-১০ম, এসএসসি বা সমমান) এবং হায়ার সেকেন্ডারি (৯ম-১০ম, এইচএসসি বা সমমান)।

শুরুতে শিক্ষার্থীদের আঞ্চলিক পর্বের জন্য অনলাইনে নিবন্ধন করতে হবে। আঞ্চলিক পর্ব থেকে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজিত হবে জাতীয় পর্ব। সেখান থেকে জাতীয় আবাসিক বায়োক্যাম্পে শর্টলিস্টেড হয়ে অনাবাসিক বায়োক্যাম্পে যেতে হবে। এই ক্যাম্প থেকে বাছাই করা হবে আন্তর্জাতিক জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের বাংলাদেশ দল।

গ্রন্থনা : বিজ্ঞানচিন্তা ডেস্ক

চোখ যে ডিপফেকের কথা বলে!

চোখে চোখ রাখুন। চোখের প্রতিফলন ফাঁস করে দেবে ডিপফেকের কারসাজি।

চোখের মণির প্রতিফলন বিশ্লেষণ করে সহজেই বোঝা যায়, বাঁয়ে স্কারলেট জোহানসনের ছবিটি আসল আর ডানের ছবিটি ফেক বা ভুয়া

বাংলা সিনেমার গানেও যে থাকতে পারে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত, তা কি আপনি জানেন? *আজ গায়ে হলুদ* সিনেমার বিখ্যাত গান, 'চোখ যে মনের কথা বলে'। একটু বদলে দিয়ে লাইনটা এভাবে বলাই যায়—চোখ যে ডিপফেকের কথা বলে! তা এই ডিপফেক জিনিসটা কী? নামটা হয়তো শুনেছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ইন্টারনেটের কল্যাণে। জিনিসটা হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে বানানো 'ফেক' বা ভুয়া ছবি। কিন্তু সেই ভুয়া যা-তা জিনিস নয়। আসলের এত কাছাকাছি যে দেখে বোঝা মুশকিল। নতুন এক গবেষণা বলছে, সেই ভুয়া জিনিসের কারসাজি ফাঁস করে দিতে পারে চোখের মণির প্রতিফলন। এই কৌশল ব্যবহার করে গ্যালাক্সির রহস্য অনুসন্ধান করেন জ্যোতির্বিদেরা। একই কৌশল খাটিয়ে ভুয়া ছবি কেমন করে শনাক্ত করা যায়, সে বিষয়ে সাম্প্রতিক গবেষণাটি উপস্থাপন করা হয়েছে হালে অনুষ্ঠিত ইংল্যান্ডের রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির ন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমি মিটিংয়ে।

বাস্তব ছবিতে দুই চোখের প্রতিফলন একই রকম থাকে, একই কথা বলে, একই ছবি ফুটিয়ে তোলে। ডিপফেকে তা হয় না। যেমন ধরুন, বাস্তবে দুই চোখের প্রতিফলনেই দেখা যায় একই সংখ্যক জানালা। কিন্তু এআইয়ের বানানো ভুয়া ছবিতে জানালার সংখ্যা প্রায়ই মেলে না। পদার্থবিজ্ঞান বলে, এমনটা হওয়ার কোনো কারণ নেই। এ কথাই যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব হালের জ্যোতির্বিদ কেভিন পিম্বলেটের ভাষ্যে উঠে এসেছে, 'এককথায়, এতে পদার্থবিজ্ঞান ভুলভাবে ধরা দেয়।' আদেজুমোকে ওয়োলাবি নামে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীর সঙ্গে যৌথভাবে এ গবেষণা করেছেন তিনি।

বিষয়টির আরেকটু গভীরে ঢুকলে দেখব, এ জন্য দুই বিজ্ঞানী ব্যবহার করেছেন 'জিনি কোফিশিয়েন্ট' নামে একটা জিনিস। জ্যোতির্বিদেরা এই সহগ ব্যবহার করে বুঝতে পারেন, একটা গ্যালাক্সির বিভিন্ন ছবিতে আলো কীভাবে ছড়িয়ে আছে। ছবির ক্ষুদ্রতম একক পিক্সেল। এক পিক্সেলজুড়ে আলো থাকলে এই সহগের মান হবে ১। আর আলো যদি পিক্সেলজুড়ে সমানভাবে ছড়িয়ে থাকে, তাহলে এই সহগের মান হবে ০। যেহেতু আলো কোনো কিছুতে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এলেই সেটা ধরা পড়ে আমাদের চোখে (বা টেলিস্কোপে), তাই এভাবে জ্যোতির্বিদেরা বুঝতে পারেন, একটা গ্যালাক্সির আকৃতি আসলে কেমন। ছবিতে আলোর ছড়িয়ে থাকা পিক্সেলগুলো হিসাব করে বোঝা যায় গ্যালাক্সির আকৃতি সর্পিল, নাকি উপবৃত্তাকার ইত্যাদি।

এ পদ্ধতিই মানুষের ছবির ওপর প্রয়োগ করেছেন কেভিন ও আদেজুমোকে। প্রথমে একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহার করে মানুষের চোখের ছবিতে আলোর প্রতিফলন শনাক্ত করেছেন। তারপর এতে পিক্সেলের মান কত আসে, তা বের করেছেন। এই মান ব্যবহার করে হিসাব করেছেন জিনি কোফিশিয়েন্ট। দেখা গেছে, বাস্তব ছবিতে দুই চোখে এই সহগের মান প্রায় এক। পার্থক্য নিতান্ত অল্প। কিন্তু ভুয়া ছবিতে দুই চোখে এ সহগের মানে দেখা গেছে বিপুল পার্থক্য।

এ থেকে কি নিশ্চিতভাবে বলা যাবে ছবিটা ভুয়া? কেভিন বলছেন, না, এই পার্থক্য পাওয়া গেলে চট করে বলার উপায় নেই ছবিটা ভুয়া। তবে পার্থক্য না থাকলে ছবিটা যে বাস্তব, তা নিশ্চিত করে বলা যায়। মানে তিনি বলছেন, 'জিনি কোফিশিয়েন্টে মানের পার্থক্য পাওয়া গেলে বুঝতে হবে, কোথাও কোনো গন্ডগোল আছে। বিশেষজ্ঞ কারও সেটা আরও ভালোভাবে খতিয়ে দেখতে হবে।'

এ পদ্ধতি ভিডিওতেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। তাত্ত্বিকভাবে। তবে ভুয়া ও বাস্তব ছবির পার্থক্য বুঝতে এটাই শেষ কথা নয়। এ নিয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন, প্রয়োজন আরও ভালো ও নিখুঁত পদ্ধতি।

চোখের মণির প্রতিফলন বিশ্লেষণ করে কম্পিউটার বুঝতে পারে, কোন চোখজোড়া এআইয়ের বানানো ডিপফেক

গ্রন্থনা : বিজ্ঞানচিন্তা ডেস্ক
সূত্র : নেচারঅ্যারোস ডটঅর্গ

নাসির আল-দিন আল-তুসি

পারস্যের দার্শনিক, গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী

১২০১-১২৭৪

আলবার্ট আইনস্টাইনের জন্মের কয়েক শ বছর আগে ইসলামি বিশ্বে অন্য একটি নাম সবার কাছে 'জিনিয়াস' হিসেবে পরিচিত ছিল। আল-তুসি। নাসির আল-দিন আল-তুসি শৈশবেই বাবাকে হারান। বাবার শেষ ইচ্ছা ছিল, নাসির যেন ঠিকভাবে পড়াশোনা করেন। ঠিক তা-ই করেছিলেন তিনি। গণিত, পদার্থবিজ্ঞান থেকে শুরু করে দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্র পর্যন্ত নানা বিষয় অধ্যয়ন করেছিলেন। সব বিষয়েই তিনি ছিলেন ক্লাসের সবার সেরা! বিস্তৃত প্রতিভা তাঁকে সমাজে ও ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। তাই শত শত বছর পরও তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

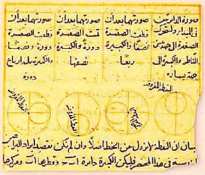

যন্ত্রসহকারে করা পরিমাপ আল-তুসিকে রাতের আকাশের গ্রহগুলোর বৃত্তাকার গতিবিধি সঠিকভাবে বর্ণনা করতে সাহায্য করেছিল।

প্রাচীন গ্রিক ও অন্যান্য সভ্যতার পুরোনো গ্রন্থ এবং ধারণাগুলো নিয়ে পড়াশোনা করেন নাসির। পরে জ্ঞানের সেসব শাখাকে আরও উন্নত করেন তিনি।

এক গ্রন্থাগারে নানা ধরনের জ্ঞানের সম্মিলন

প্রায় ১২২০ সালের কথা। চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে মোঙ্গল বাহিনীর নির্মম শাসকেরা নাসিরের মাতৃভূমি আক্রমণ করেন। নাসির জীবন বাঁচাতে আলামুতের দুর্গে পালিয়ে যান। জায়গাটি বর্তমান ইরানে অবস্থিত। তিনি বেশ পছন্দ করে ফেলেন দুর্গটি। কারণ, সেখানে একটি দারুণ গ্রন্থাগার ছিল। তুসি সেখানে পড়াশোনা করতেন। ১২৫৬ সালে মোঙ্গলদের হাতে আলামুত দুর্গটি ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু তারা নাসিরকে বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত করে। চেঙ্গিস খানের নাতি হালাকু খানকে তিনি একটি বিশাল মানমন্দির নির্মাণে রাজি করান। মানমন্দিরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করেন। এটি বর্তমান আজারবাইজানে অবস্থিত।

সেখানে পারস্য ও চীনের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সম্মিলিতভাবে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি পরিমাপের জন্য যন্ত্র তৈরি করেন। সেগুলো তারা কাজেও লাগিয়েছিলেন। নাসির নিজেও এ রকম কিছু যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। মানমন্দিরটি ধীরে ধীরে গুরুত্বপূর্ণ এক শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। পরে সেখানে চমৎকার এক গ্রন্থাগারও গড়ে ওঠে। এর মাধ্যমে মানমন্দিরটি পূর্ণতা পায়।

চেঙ্গিস খান

আলামুতের দুর্গে থাকাকালে নাসির অনেক বিষয় নিয়ে লিখেছিলেন। যেমন নীতিশাস্ত্র এর আলোচ্য বিষয়, কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল।

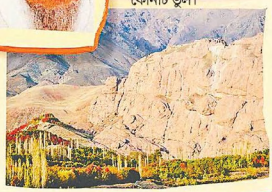

জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, জীববিজ্ঞানসহ নানা বিষয়ের ওপর নাসির ১৬০টির বেশি বই ও গবেষণাপত্র রচনা করেন। যেমন তিনি গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক সমস্যা সমাধানে ত্রিকোণমিতির (ত্রিভুজবিষয়ক পড়াশোনা) ভূমিকা সম্পর্কে লিখেছিলেন। তাঁর প্রশ্ন এবং আইডিয়াগুলো যুগে যুগে পৃথিবীর অনেক দেশের গবেষকদের অনুপ্রাণিত করেছে।

সদা পরিবর্তনশীল প্রাণী

মহাকাশের মতো পৃথিবীর প্রতিও একই রকম মনোযোগ দিয়েছিলেন আল-তুসি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীরা কীভাবে বিকশিত হয় ও বদলে যায়, তা ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি একটি তত্ত্ব দিয়েছিলেন। অভিযোজনের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তাতে পারস্যের গ্যাজেল হরিণের দীর্ঘ শিং এবং বাজের ধারালো নখরের কথাও ছিল।

শত শত বছর পরও নাসিরের কাজ নিকোলাস কোপারনিকাসের মতো বিজ্ঞানীদের অনুপ্রাণিত করেছিল, আজও করছে!

সায়েন্টিস্ট অবলম্বনে কাজী আকাশ

কার্যকারণ

আব্দুল কাইয়ুম

কাশি-ঠান্ডা-জ্বর কীভাবে রোধ করা যায়

শীতের শুরুতে আমাদের অনেকের হালকা কাশি হয়, ঠান্ডা লেগে হয়তো সামান্য জ্বরও আসে। তাই আবহাওয়া পরিবর্তনের সময় খুব সাবধানে থাকতে হয়। কারণ, এ ধরনের রোগ খুব ছোঁয়াচে। প্রশ্ন হলো, সংক্রমণ রোধের কোনো সহজ উপায় আছে কি? হ্যাঁ আছে। সতর্ক থাকতে হবে যেন কাছাকাছি কারও হাঁচি-কাশি থেকে আমরা সংক্রমিত না হই। কারণ, পাশের কেউ হাঁচি দিলে আমরা সহজেই ভাইরাসে সংক্রমিত হতে পারি। চোখও খুব স্পর্শকাতর। সহজেই ঠান্ডা লেগে চোখে পানি ঝরতে শুরু করে। এ জন্য সহজে চোখ যেন আক্রান্ত না হয়, সেটা দেখা দরকার। হাতের মাধ্যমেও সংক্রমণ ঘটে। তাই হাত পরিষ্কার রাখা দরকার। হাত দিয়ে চোখ মোছা উচিত নয়। ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব ঘটলে ভিড়ের মধ্যে চলাফেরা এড়ানো ভালো। বিলাত-আমেরিকায় প্রায়ই এ ধরনের ছোঁয়াচে রোগ থেকে রক্ষার উপায় নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে সমীক্ষা চালানো হয়। দেখা গেছে, চোখ ও নাক বেশি নাজুক। বিশেষজ্ঞরা বলেন, স্বাভাবিক পরিবেশে নাক দিয়ে শ্বাস গ্রহণ সবচেয়ে নিরাপদ। কারণ, নাকের ভেতর দিয়ে বাইরের বাতাস দীর্ঘ সরু পথে এঁকেবেঁকে যাওয়ার সময় ধুলাবালুমুক্ত হয় এবং শরীরের তাপমাত্রা গ্রহণ করে ফুসফুসের জন্য সহনীয় পর্যায়ে যায়। সুস্থ শরীরের জন্য এটা দরকার।

বয়স বাড়লে মানুষের মস্তিষ্কও কি বুড়ো হয়

বয়স বাড়লে মানুষের শারীরিক গঠনে পরিবর্তন আসে। শারীরিক বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু একপর্যায়ে বার্ধক্যের এই গতি কমে আসে। একসময় বলি, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মস্তিষ্কের গঠনবৈচিত্র্য একটু ভিন্ন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কও বুড়ো হয়, কিন্তু এই বার্ধক্য একটু ভিন্ন ধরনের। অনেক সময় দেখা যায়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক উচ্চতা হয়তো আর বাড়ে না, কিন্তু মস্তিষ্কের বুদ্ধি-বিবেচনা বাড়ে। এ বিষয় নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। হার্ভার্ডের নিউরোলজিস্ট লেহ এইচ সমারভিল *নিউরন* জার্নালে এই বিষয়ে একটি নিবন্ধ লেখেন। তিনি বলেন, মানুষের মস্তিষ্ক ১০ বছরের মধ্যে পূর্ণ আকার ধারণ করে। কিন্তু যে নিউরন দিয়ে মস্তিষ্ক গঠিত, সেগুলো এরপরও পরিবর্তিত হতে থাকে (সূত্র: *নিউইয়র্ক টাইমস*, ২১ ডিসেম্বর ২০১৬)। যখন মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের মধ্যে নতুন নতুন সংযোগ স্থাপিত হয়, তখন পার্শ্ববর্তী নিউরনগুলোর মধ্যে সংযোগেরও কাটছাঁট হয়। এই পুনরাকৃতি ধারণের প্রক্রিয়ার গতি শেষ পর্যন্ত কমে আসে। এটা মস্তিষ্কের পরিণতি প্রাপ্তির লক্ষণ। কিন্তু মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে এই পরিবর্তনের ধারা বিভিন্ন গতিতে ঘটে। মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোবের এমআরআই স্ক্যানে দেখা গেছে, বয়স

বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের পুনর্বিন্যাসের গতি কমে যায়। কিন্তু ফ্রন্টাল লোবে, এমনকি ৩০ বছর বয়সেও নিউরনের নতুন নতুন সংযোগ সৃষ্টি হয়। সম্প্রতি বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে বৃদ্ধ বয়সেও মানুষের মস্তিষ্কে নিউরনের নতুন নতুন সংযোগ সৃষ্টি হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়ামের ধরনও বদলাতে হয়। বেশি বয়সে সাধারণত হালকা ব্যায়াম করার কথা বিশেষজ্ঞরা বলেন।

প্রশ্নোত্তরে বিজ্ঞান

উত্তর দিচ্ছেন সম্পাদক **আব্দুল কাইয়ুম**

প্রশ্ন : চলন্ত সাইকেল পড়ে যায় না কেন?

উত্তর : সাধারণ অভিজ্ঞতায় আমরা দেখি, চলতে থাকলে সাইকেল কখনো কাত হয়ে পড়ে যায় না, কিন্তু গতি একটু কমে এলে এক পাশে হেলে পড়ে। তখন ব্যালান্স রাখা কঠিন। এ রকম কেন হয়? এর মূল কারণ হলো, সাইকেলের চাকার ঘূর্ণনগতির ফলে একটি সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স চাকার তল বরাবর লম্বভাবে কাজ করে। যতক্ষণ সাইকেল ঠিক খাড়াভাবে চলে, ততক্ষণ এর ওপর কোনো আনুভূমিক বল কাজ করে না। কিন্তু চলমান সাইকেল যদি একটু হেলে পড়ে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের একটি আনুভূমিক উপাংশ তাকে আবার সোজা অবস্থানে ফিরিয়ে আনে। সাইকেলের গতি কমে গেলে এই বল কাজ করে না। সাইকেল পড়ে যায়।

প্রশ্ন : পৃথিবীর কেন্দ্রে g-এর মান শূন্য কেন?

উত্তর : পৃথিবীর কেন্দ্রে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ 'g'-এর মান শূন্য—এটা আমরা পাঠ্যবইয়ে পড়েছি। প্রশ্ন হলো, কেন শূন্য? আসলে কোনো বস্তু যদি পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থান করে, তাহলে তার ওপর পৃথিবীর চারপাশের ভর তাকে সমভাবে টানবে। ফলে একে অপরকে নাকচ করবে। ওই বস্তুর ওপর মাধ্যাকর্ষণ বল শূন্য হয়ে যাবে। তাহলে কি বলব, এখানে মহাকর্ষবলের সূত্র কাজ করে না? আসলে নিউটনের মহাকর্ষবলের সূত্র তখনই কার্যকর হয়, যখন দুই বস্তুর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব থাকে। কিন্তু পৃথিবীর কেন্দ্রে যেহেতু বস্তুর দূরত্ব শূন্য, অর্থাৎ কেন্দ্রের ভেতরে বস্তুর অবস্থানের কারণে পৃথিবী ও বস্তুর ভর সম্মিলিতভাবে কার্যত একটি একক বস্তুর রূপ ধারণ করে, তাই সেখানে দুই বস্তুর মধ্যে মহাকর্ষবলের সূত্রটি খাটে না।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের কাছে প্রশ্ন লিখে পাঠান। আমাদের ঠিকানায় চিঠি লিখুন কিংবা ই-মেইল করুন। খামের ওপর অবশ্যই 'কার্যকারণ' কথাটি লিখবেন। অথবা ই-মেইল পাঠাতে পারেন এই ঠিকানায় : editor@bigganchinta.com

সুডোকু ৪৬

সুডোকু বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় বুদ্ধিবৃত্তিক ধাঁধা। বুদ্ধির ব্যায়াম করতে, নিউরনের ক্ষমতা বাড়াতে কিংবা সময়কে আনন্দময় করতে এই জাপানি ধাঁধা সহায়ক হতে পারে। প্রতিটি কলাম ও সারিতে ১-৯ পর্যন্ত সব কটি অঙ্ক মাত্র একবার বসাতে হবে। তেমনি প্রতিটি ৩×৩ বর্গক্ষেত্রের ভেতরেও ১-৯ পর্যন্ত সব কটি অঙ্ক একবার বসবে। নিচের সুডোকুটি পূরণ করুন। উত্তর দেখুন অন্য পাতায়।

সুডোকু ০১

				২				৯
	১			৩		২		৮
		৪	১				৫	
		৮			৩			২
		৭				৯		
১			৮			৬		
	৬				১	৩		
২		১		৯			৭	
৩				৮				

সুডোকু ০২

	৭			৩				
		৬			৮			
	২					৫	১	
৪	১				৯	২		
		৫	৪		৭	৮		
		৯	৬				৩	৭
	৯	৮					৫	
			৮			৬		
				৯			৭	

ইঁদুর ধরতে কত সময় লাগবে

আব্দুল কাইয়ুম

প্রথমে আমরা কোনো বর্গসংখ্যার একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলি। কোনো বর্গসংখ্যার শেষে যদি শূন্য থাকে, তাহলে সেখানে অন্তত দুটি শূন্য থাকতে হবে। কেন, সেটা বলছি। সংখ্যাটি ১০-এর গুণফল হলেই এর শেষ অঙ্কটি শূন্য হবে। ১০ = ২ × ৫। এর বর্গ করলে পাব $(১০)^২ = ১০০ = ২^২ \times ৫^২ = ৪ \times ২৫$। এই সংখ্যাকে আবার বর্গ করলে পাব $২^৪ \times ৫^৪ = ১৬ \times ৬২৫ = ১০,০০০$ ইত্যাদি। তাই আমরা বলতে পারি, কোনো বর্গসংখ্যার শেষে জোড়সংখ্যক শূন্য থাকে।

এ মাসের ধাঁধা

৩টি বিড়াল ৩ মিনিটে ৩টি ইঁদুর ধরতে পারলে ১০০টি বিড়ালের ১০০টি ইঁদুর ধরতে কত সময় লাগবে?

ধাঁধার উত্তর দ্রুত বিজ্ঞানচিন্তায় পাঠিয়ে দিন। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

গত সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

ধাঁধাটি ছিল এ রকম : বলুন তো $৮^{১৬}$ বড়, নাকি $১৬^৮$?

উত্তর

$৮^{১৬}$ সংখ্যাটি বড়।

কীভাবে উত্তর বের করলাম

প্রথমে সংখ্যা দুটিকে ২-এর পাওয়ার হিসেবে প্রকাশ করি। এখন যে সংখ্যাটির ২-এর পাওয়ার বেশি, সেই সংখ্যা বড় হবে।

যেমন প্রথম সংখ্যা $৮^{১৬} = ২^{৩ \times ১৬} = ২^{৪৮}$ এবং দ্বিতীয় সংখ্যা = $১৬^৮ = ২^{৪ \times ৮} = ২^{৩২}$

তাই আমরা বলতে পারি, প্রথম সংখ্যা, অর্থাৎ $৮^{১৬}$ সংখ্যাটিই বড়।

ডিসেম্বর সংখ্যার সঠিক ১০ উত্তরদাতা

মুহাইমিনুল ইসলাম, মদনগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
মো. রিফাত সময়, বোয়ালিয়া, রাজশাহী
সামিরা তাসনিম, হাফরাস্তা, নাটোর
আবদুল্লাহ আল মাহিদ, মাসকান্দা, ময়মনসিংহ
রেনেসা রাতুল, উত্তরা, ঢাকা
আবদুল জলিল, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম
ইফাজ উদ্দিন, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম
হুমায়রা আক্তার, আজিমপুর, ঢাকা
রুফাইদা রহমান, কানাইখালী, নাটোর
মুর্শিদা আক্তার, শাসনগাছা, কুমিল্লা

পাঠক যখন লেখক

হয়তো আপনার ভেতরেই লুকিয়ে আছে আগামী দিনের বিজ্ঞান লেখক। হয়তো আপনি চাইছেনও কিছু একটা লিখতে। তবে দেরি কেন, ৫০০ শব্দের ভেতর লিখে ফেলুন বিজ্ঞান বা গণিতবিষয়ক কোনো ফিচার কিংবা মজার তথ্য। পাঠাতে পারেন বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের খবরও। তবে যা-ই লিখুন, সেটাতে যেন বৈজ্ঞানিক যুক্তি, ব্যাখ্যা এবং সূত্রটা থাকে ঠিকমতো। তারপর লেখাটা পাঠিয়ে দিন বিজ্ঞানচিন্তার দপ্তরে। মানসম্মত লেখাগুলো প্রকাশ করা হবে বিজ্ঞানচিন্তা অনলাইন বা প্রিন্ট সংস্করণে। লেখা পাঠাতে পারেন—editor@bigganchinta.com ঠিকানায়। অথবা লেখা অ্যাটাচ করে দিতে পারেন facebook.com/bigganchinta এই পেজের ইনবক্সেও। ডাকযোগে বা কুরিয়ারে লেখা পাঠানোর ঠিকানা : **বিজ্ঞানচিন্তা**, ১৯, প্রথম আলো ভবন, কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২১৫।

রসায়ন কুইজ ৯৭

১. কোন মৌলটি পানি ছাড়াও পুড়তে পারে?

ক. অক্সিজেন
খ. ফসফরাস
গ. নাইট্রোজেন

২. কোন প্রক্রিয়ায় একটি কঠিন পদার্থ সরাসরি গ্যাসে পরিণত হয়?

ক. বাষ্পীভবন
খ. ঘনীভবন
গ. ঊর্ধ্বপাতন

৩. পর্যায় সারণির কোন গ্রুপের মৌলকে হ্যালোজেন বলে?

ক. গ্রুপ ৭
খ. গ্রুপ ১৭
গ. গ্রুপ ১৮

রসায়ন কুইজ ৯৬-এর উত্তর

১. খ. পারদ
২. ক. পানি ও লবণ
৩. ক. Au

পদার্থবিজ্ঞান কুইজ ৯৭

১. কোন ধরনের শক্তির সাহায্যে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে?

ক. তাপশক্তি
খ. রাসায়নিক শক্তি
গ. বৈদ্যুতিক শক্তি

২. কোন রঙের আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি?

ক. লাল
খ. নীল
গ. সবুজ

৩. কোনো বস্তুর ঘনত্ব নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?

ক. ভর/ত্বরণ
খ. ভর/আয়তন
গ. বল/ত্বরণ

পদার্থবিজ্ঞান কুইজ ৯৬-এর উত্তর

১. গ. স্থিতিস্থাপক শক্তি
২. খ. তাপের সম্প্রসারণ
৩. গ. কিলোগ্রাম

মহাকাশবিজ্ঞান কুইজ ৯৭

১. পৃথিবীর ছায়া চাঁদকে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ঢেকে দেওয়াকে কী বলে?

ক. চন্দ্রগ্রহণ
খ. সূর্যগ্রহণ
গ. ধূমকেতু ঝড়

২. পৃথিবীর চারপাশে অনেক কৃত্রিম উপগ্রহ ঘোরে। এগুলো কোন শক্তির কারণে পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে?

ক. চৌম্বক শক্তি
খ. যান্ত্রিক শক্তি
গ. মহাকর্ষ শক্তি

৩. কোন গ্রহটি তার নিজ অক্ষে সবচেয়ে দ্রুত ঘোরে?

ক. পৃথিবী
খ. বৃহস্পতি
গ. শনি

মহাকাশবিজ্ঞান কুইজ ৯৬-এর উত্তর

১. গ. দূরত্বের
২. ক. ৯.৮ মিটার/সেকেন্ড^2
৩. খ. স্পেস শাটল প্রোগ্রাম

প্রতিটি কুইজের উত্তর আলাদা কাগজে লিখে পাঠাতে হবে। না হলে উত্তর গ্রহণযোগ্য হবে না। একই খামে একাধিক কুইজ পাঠানো যাবে। আগে কাগজে বড় করে কুইজের নাম লিখে পরে উত্তর এবং নিজের পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখতে হবে। খামের ওপর প্রথমে বড় করে লিখতে হবে 'কুইজ', তারপর পাঠিয়ে দিতে হবে নিচের ঠিকানায়। প্রতিটি বিভাগে তিনজন করে কুইজ বিজয়ীর প্রত্যেকে পাবেন রকমারি ডট কম-এর সৌজন্যে ৩০০ টাকার বই। কুইজের উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২৫।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা : **বিজ্ঞানচিন্তা**, প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

জীববিজ্ঞান কুইজ ৯৭

১. মানবদেহের ফিল্টার নামে পরিচিত নিচের কোন অঙ্গটি?

ক. যকৃৎ
খ. কিডনি
গ. ফুসফুস

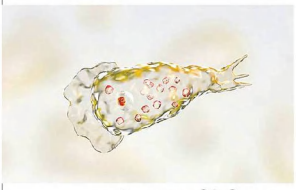

২. নিচের কোন প্রাণীটি জীবনের পুরোটা সময় এককোষী হিসেবে কাটায়?

ক. অ্যামিবা
খ. প্লানারিয়া
গ. জলজ শামুক

৩. শরীরে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে কোন হরমোন?

ক. অ্যাড্রানালিন
খ. ইনসুলিন
গ. থাইরক্সিন

জীববিজ্ঞান কুইজ ৯৬-এর উত্তর

১. খ. রাইবোজোম
২. খ. ভিটামিন কে
৩. গ. জীবাণুতত্ত্ব

প্রযুক্তি কুইজ ৬৯

১. ওয়েবপেজ লোড করতে কোন প্রোটোকল ব্যবহৃত হয়?

ক. এফটিপি
খ. এসএমটিপি
গ. এইচটিটিপি

২. ওয়াই-ফাই রাউটারে ডেটা পাঠানোর জন্য কোনটি ব্যবহৃত হয়?

ক. রেডিও তরঙ্গ
খ. আলোকতরঙ্গ
গ. শব্দতরঙ্গ

৩. ব্লুটুথ সর্বোচ্চ কত দূর পর্যন্ত কাজ করে?

ক. ১০ মিটার
খ. ৫০ মিটার
গ. ১০০ মিটার

প্রযুক্তি কুইজ ৬৮-এর উত্তর

১. গ. ইউএসবি
২. ক. রেডিও তরঙ্গ
৩. খ. আডা লাভলেস

বিজ্ঞানচিন্তার গ্রাহক হোন

এক বছর বা ছয় মাসের গ্রাহক হয়ে

ঘরে বসেই সংগ্রহ করুন
বিজ্ঞানচিন্তা

গ্রাহক হতে ফোন করুন নিচের নম্বরে
০১৭০৮৪১১৯৯৬

ডেলিভারি চার্জ ছাড়া ঘরে বসে পেতে চাইলে যোগাযোগ করুন :
prothoma.com

বিজ্ঞানচিন্তা

বিজ্ঞানচিন্তার ডিসেম্বর সংখ্যার কুইজ বিজয়ী

গত সংখ্যার সব বিভাগের কুইজের উত্তর অনেকেরই সঠিক হয়েছে। তবে লটারির মাধ্যমে প্রতিটি বিভাগে ৩ জন করে ১৫ জন বিজয়ীকে বাছাই করা হয়েছে। বিজয়ী প্রত্যেকে পাবেন ৩০০ টাকার বই। বিজয়ীদের অভিনন্দন।

সৌজন্যে
অন্যরকম বিজ্ঞানবাক্স
বাংলাদেশের প্রথম সায়েন্স কিট

রসায়ন কুইজ ৯৬

তাজবীর হামিদ
গফরগাঁও পৌরসভা, ময়মনসিংহ

এনামুল হক
শ্যামলী, ঢাকা

সঙ্ঘমিত্র সরকার
টিকাটুলী, ঢাকা

পদার্থবিজ্ঞান কুইজ ৯৬

এস এম মিনহাজ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

তাসফিয়া কবির
রামেক, রাজশাহী

তাসকিন আলম
কাপাসিয়া, গাজীপুর

মহাকাশবিজ্ঞান কুইজ ৯৬

জিনিয়া আলম
উত্তরা, ঢাকা

স্নিগ্ধেন্দু মণ্ডল
দৌলতপুর, খুলনা

তাসনিয়া বিনতে আশরাফ
বাবু খান রোড, খুলনা

জীববিজ্ঞান কুইজ ৯৬

সুবাইতা রহমান
কানাইখালী, নাটোর

আলেয়া বেগম
জামালখান, চট্টগ্রাম

স্নেহা তাসনিম
চাঁদপুর পৌরসভা, চাঁদপুর

প্রযুক্তি কুইজ ৬৮

মোসা. শাহরিন আক্তার
তেঘরিয়া, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

অঙ্কন ঘোষ
মল্লিকহাটি, নাটোর

মিরাজুল ইসলাম
আলাইপুর, নাটোর

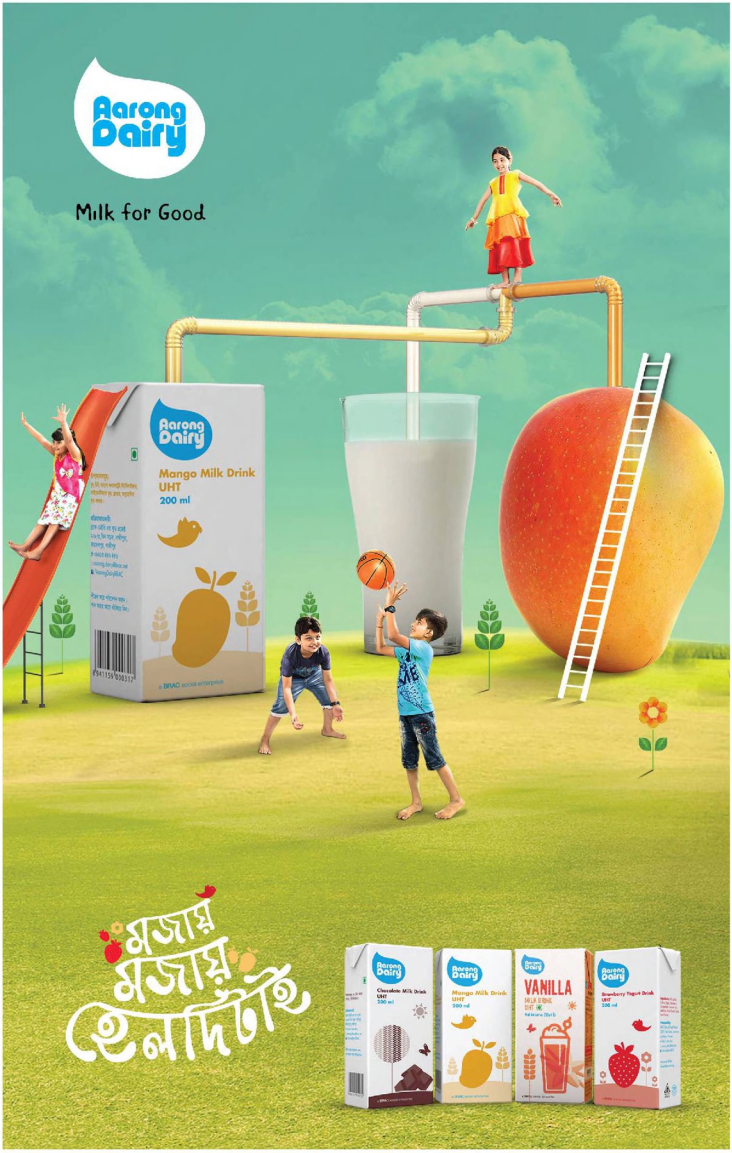
Aarong Dairy
Milk for Good
Aarong Dairy
Mango Milk Drink
UHT
200 ml
মজায় মজায় খেলাটাই
Aarong Dairy
Chocolate Milk Drink
UHT
200 ml
Aarong Dairy
Mango Milk Drink
UHT
200 ml
Aarong Dairy
VANILLA
Aarong Dairy
Strawberry Yogurt Drink
UHT
200 ml

মমতায় বাড়াই সম্পর্কের গভীরতা

৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পর্কগুলোকে মমতায় ঘিরে রেখেছে তীর।
তাইতো সরিষার তেল থেকে শুরু করে রেডি মিক্স পর্যন্ত সবকিছুতেই
বিশুদ্ধতার প্রশ্নে কখনোই আপস করেনি তীর।

ডিভিওটি দেখতে স্ক্যান করুন
www.citygroup.com.bd /TEER1972